১০ই নভেম্বর

স্মরণে

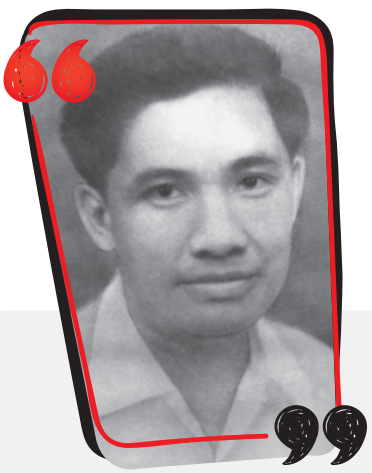


পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি


Implement CHT Accord Fully
Stop militarization in CHT
আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা বন্ধ কর।
We Want Justice
পাহাড় থেকে সমতলে লড়াই হবে আদিবাসী
দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনপূর্বক পাহাড় ও সমতলের নারী নিপীড়কের বিচার নিশ্চিত কর
সারাদেশে অব্যাহত নারী ধর্ষণ ও নিপীড়ন এবং বান্দরবানের
রোয়াংছড়িতে এক আদিবাসী নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে
মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
স্থান : রাজু ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখ: ১২ মার্চ ২০২৫, বুধবার, সময়: বিকাল ৩-৩৫ঘটিকা
আয়োজনে: ঢাকাস্থ আদিবাসী ছাত্র সমাজ


১০ই নভেম্বর ৪৩ অমর
বিপ্লবী পন্থী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল প্রতিরোধ
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতর সামিল হোন
মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস
জুম্ম জাতীয় শোক দিবস ২০২৫
১০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ সোমবার
প্রভাতফেরী
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কামটি





১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০২৬

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৪
প্রবন্ধ	০৬-৩২
গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা ও এম এন লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদ – পাভেল পার্থ	০৬
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জীবন ও দর্শন – কাঞ্চনা চাকমা	১৪
পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতা – উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন	১৮
এম এন লারমার প্রতিবেশ জাতীয়তাবাদ – ড. ঈশিতা দস্তিদার	২৪
স্মৃতি চারণ – শরৎ জ্যোতি চাকমা	২৫
পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের অপহরণের শিকার আমরা পাঁচজন – কিশোর কুমার চাকমা	২৮
কবিতা	৩৩-৩৭
পাহাড়ে আলোর প্রদীপ – শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা	৩৩
পাহাড়ের জীবন – উদ্দীপন চাকমা	৩৪
বিবর্ণ পাহাড়ের হাহাকার – ইমন চাকমা	৩৬
বিপ্লবী প্রেমিক – শুভময় তঞ্চঙ্গ্যা	৩৬
পিষ্ট পাহাড় – সম্রাট সুর চাকমা	৩৭
হে তরুণ! – ইনজেব চাকমা	৩৭
বিশেষ প্রতিবেদন	৩৮-৫১
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারের তিনটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন সম্পর্কে–	৩৮
(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি	৩৮
(b) Joint Statement of CHTC and IWGIA	৪১
(গ) ৫২ জন নাগরিকের যৌথ বিবৃতি	৪৫
(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনসাধারণের স্মারকলিপি	৪৭
(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের বিবৃতি	৪৯
(চ) রাজধানীতে ছাত্র-যুব সংগঠনগুলোর গণসংযোগ	৫০
সংবাদ প্রবাহ	৫২-১২৩
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন	৫২
সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা	৫৭
অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা	৬১
যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা	৬৮
সংগঠন সংবাদ	৬৮
এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন	৯২
শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের কর্মসূচি	১০৪
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন	১০৮
আন্তর্জাতিক সংবাদ	১১৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি	১২০



সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি বর্তমানে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহতভাবে চলছে। আদিবাসী জুম্মদের প্রথাগত জুমভূমি ও মৌজাভূমি বেআইনিভাবে ও সুকৌশলে জবরদখল করার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে জমি দখল ও জুম্মদের উচ্ছেদ করার প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর সাড়ে আট মাস অতিক্রান্ত হলেও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো বর্তমান বিএনপি সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নীতি অব্যাহত রেখেছে।

ফলে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। পূর্বের মতই নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর নানা ধরনের নিপীড়ন, মানবাধিকার হরণ, সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চুক্তির সমর্থক ও নিরীহ জুম্মদের উপর সন্ত্রাস এবং সেটেলার বাঙালি ও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জুম্মদেরকে হামলা, হয়রানি, ভূমি বেদখল, পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, ধর্মান্তরকরণ ও জুম্ম নারী-শিশুদের উপর সহিংসতা ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে।

বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ১৮০ দিনের কর্মসূচি দিয়েছিল। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে ১৮০ দিনের কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখার আহ্বান জানিয়ে ৩ মার্চ ২০২৬ সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার গঠনের পর ১৮০ দিন শেষ হয়ে গেলেও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মিছিল, সমাবেশ, সেমিনার, গ্রাফিতির দেয়াল এবং জনপরিসরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার স্থায়ী অবসানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল।

এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনকালে সেনাবাহিনী সমর্থিত মুসলিম বাঙালি সেটেলার কর্তৃক বিভিন্ন সংগঠনের নামে আদিবাসী স্বীকৃতির দাবি ও



আদিবাসী শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাউন্টার কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এইসব কর্মসূচিতে আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিকে বিরোধিতার নামে প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতিগত বিদ্বেষ, হিংসা ও মিথ্যাচার ছড়ানো হয়েছে। এতে বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্যায় আধিপত্যবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির বিরোধিতাকারী এইসব মহলের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন সংগঠনসমূহ যেমন রয়েছে, তেমনি উদ্বেগজনকভাবে এইসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মসহ সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, সাবেক সেনা কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও ছাত্র। এই ধরনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও সমর্থন আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তাকে আরো ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে বলে বিবেচনা করা যায়।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত তিনটি কমিটি "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি", "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি" গঠন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ না নিয়ে নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়নের" কথা সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

অধিকন্তু "পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত আইন, চুক্তির শর্ত ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এবং নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের" কথা উল্লেখ রয়েছে নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইনগুলোকে সংশোধন করার হীনউদ্দেশ্যেই এই কার্যপরিধি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরও জটিল ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এসব কমিটিতে সামরিক বাহিনী, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাটির সমাধানের পথ যেমন রুদ্ধ হবে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ব্যাপক সামরিকায়ন ও সেনাশাসন জোরালো হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দ্রুত, যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের চলমান বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের উপর চুক্তি বাস্তবায়নে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।



প্র ব ন্ধ

গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা ও এম এন লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদ

।। পাভেল পার্থ ।।

জুলাই গণভ্যুত্থানের দুই প্রতিরোধী দৃশ্যমান প্রবণতা ছিল শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ এবং দেশজুড়ে গ্রাফিতি। কিন্তু সেইসব দুর্বিনীত পাবলিক আওয়াজ ক্রমশই 'অদৃশ্য', 'অপর' এবং 'অস্বীকৃত' হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর যেমন গান গাওয়া হয়েছিল, 'হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না', গণঅভ্যুত্থানেও অপরায়ন হয়েছে শ্রমজীবী, আদিবাসী, শিশু ও নিম্নবর্গের ইতিহাস। টান মেরে গ্রাফিতির পাতা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। নিদারুণভাবে জনআকাঙ্ক্ষার গ্রাফিতিকে অস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এত রক্তদাগের পরেও গ্রাফিতির জনআকাঙ্ক্ষা অস্বীকৃত হলো কেন?

কারণ জনআকাঙ্ক্ষার ব্যাকরণ পাঠের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বরাবরই উপেক্ষিত। অধিপতি ইতিহাস গ্রন্থনের কায়দা ও প্রবল উপস্থাপন ভঙ্গির কাঠামোগত পরিবর্তন না হওয়াতে জুলাইকেও করে তোলা হচ্ছে এক খন্ডিত বয়ান। অথচ জুলাই এক চলমান ঐতিহাসিক প্রতিরোধী পরম্পরা। এটি কেবলমাত্র কোনো নির্দিষ্ট সময়ের 'রেজিম পরিবর্তন' মাত্র নয়। ক্ষমতার উপনিবেশ, কাঠামোগত বৈষম্য আর নিওলিবারেল প্রবল ব্যবস্থার বিপরীতে এই জুলাই ইতিহাসে বারবার জান-জবান নিয়ে দাঁড়ায়। জুলুমকে প্রশ্ন করে। এই জনপ্রতিরোধ কেবলমাত্র জালিমের নয়, জুলুমের অবসান চায়। বিদ্যমান উপনিবেশিক, বাইনারি ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন চায়। হাতিখেদা, টংক, তেভাগা, নানকা, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, কাপ্তাই বাঁধ, ফারাক্কা, মধুপুর, ফুলবাড়ি, ইয়াসমীন, আলফ্রেড কী ৯০ থেকে ২৪ গণঅভ্যুত্থান এই জীবনবাজির সাক্ষী।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে জনআকাঙ্ক্ষাগুলো দেশব্যাপি পাবলিক আওয়াজ হিসেবে দৃশ্যমান হয়েছে। এই জনআকাঙ্ক্ষার এক অন্যতম সুর আদিবাসী আত্মপরিচয় এবং আদিবাসী-বাঙালি জাতিগত সংহতি হিসেবে গ্রাফিতিতে উপস্থিত হয়েছে। জুলাই গ্রাফিতি বাইনারি বিভাজন এবং বাঙালি জাত্যাভিমানকে প্রশ্ন করেছে। আদিবাসী জীবন ও বসতিতে সামরিকায়নকে জিজ্ঞাসার পাটাতানে হাজির করেছে। মূলত বাংলা ভাষা ও বর্ণমালাতেই বেশিরভাগ গ্রাফিতি আঁকা হলেও ইংরেজি, চাকমা ও সাদরি ভাষাতেও কিছু গ্রাফিতি দেখা গেছে।

কল্পনা চাকমা অপহরণকে প্রতীক হিসেবে নিয়ে দেশব্যাপি আদিবাসী নিপীড়ন ও বঞ্চনার প্রশ্ন এবং প্রতিরোধের স্মৃতিকে গ্রাফিতির বিষয় করা হয়েছে। কল্পনা চাকমার প্রতিকৃতি, ঐতিহ্যবাহী চাকমা পোশাক, পাহাড়, জুমচাষ, পাহাড়ের পটভূমি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্লুং বাঁশি হাতে আদিবাসী, ফং ও রাও পানির পাত্র, বাঁশ, সামরিক শাসনের প্রতীকী উপস্থাপন এঁকে লেখা হয়েছে, 'কল্পনা চাকমা কোথায়', 'জাস্টিস ফর কল্পনা চাকমা', 'মিসিং নট ফরগটেন', '১৯৯৬-২০২৪: বিচার কোথায়', পাহাড় সেনাশাসন কেন' ইত্যাদি। 'আদিবাসী পরিচয়ের স্বীকৃতি', 'ইনডিজেনাস লাইভস ম্যাটার', 'উই আর ইনডিজেনাস', 'পাহাড় বাঁচাও', 'বন বাঁচাও', 'ল্যান্ড ইজ লাইফ', 'প্রকৃতি বাঁচাও', 'পরিবেশ রক্ষা কর' এসব গ্রাফিতির ভেতর দিয়ে কেবল আদিবাসী আত্মপরিচয় নয়, প্রকাশিত হয়েছে প্রাণ-প্রকৃতি ঘিরে আদিবাসী জীবনের বিশ্ববীক্ষা ও দার্শনিকতা।

জুলাইয়ের একটি গ্রাফিতে টগবগ হয়ে আছে ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরির দেয়ালে। গ্রাফিতি বলছে, 'পাহাড়ে কবে মুক্তি মিলবে'? বহু গ্রাফিতিতে লেখা হয়েছে 'পরাধীন পাহাড়'। আদিবাসী ডিসকোর্সের বয়ানে এভাবে পাহাড়কে স্টেরিওটাইপ করা অবশ্যই 'অপরায়ন' ও 'বাইনারি' তৈরি করে। যেখানে দেশের বিশাল অংশের আদিবাসী জনগণ পাহাড় নয়, চাবাগান, সমতল, গড়, টিলা ও উপকূলে বসবাস করেন। আবার পাহাড়ের এই 'পরাধীনতা' নানাভাবে বোঝা যেতে পারে। হয়তো 'উপজাতিদের' আয়নায় একরকম আবার 'সেটেলার বাঙালির' আয়নায় আরেকরকম। ম্রো, খুমি বা বম বিবরণ ত্রিপুরা বা মারমা বিবরণ দিয়া বোঝা যাবে না। আরো বহু বর্গের আয়নায় বহুরকম। কিন্তু এটি অস্বীকারের কোনো উপায় নাই 'পাহাড়' বা 'সমতল' সকল আদিবাসী জগতই নিওলিবারেল জাত্যাভিমানী অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক রাষ্ট্র দ্বারা উপনিবেশিত ও প্রান্তিক। জুলাই অভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা এই উপনিবেশিক জাত্যাভিমানকে প্রশ্ন করে বহুত্ববাদ ও অন্তর্ভূক্তির তুমুল আওয়াজ তুলেছে। কিন্তু সেই আওয়াজের ধারাবাহিকতা ক্রমশই বিলীন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ।

অভ্যুত্থানে সংস্কার, সংবিধান আর অন্তর্ভূক্তির যে জনআকাঙ্ক্ষা হাজির হয়েছিল তা আমরা চলতি আলাপে খুঁজে দেখার চেষ্টা



করবো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদের ভেতর। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের, ১৯৯৬ সালে, কল্পনা চাকমা অপহরণের পর, তবে তখন বিশদ কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত কিছু স্থানীয় প্রকাশনায় খুবই সংক্ষেপিত কিছু বিবরণ ছাড়া তেমন কিছুই হাতের নাগালে ছিল না। তারপর তাঁর গণপরিষদ বক্তৃতা হাতে আসে। কিছু স্থানীয় প্রকাশনায় পাওয়া যায় টুকটাক কিছু স্মৃতিচারণ গোছের লেখালেখি। ২০০৫ থেকে তাঁর মৃত্যু ও জন্মবার্ষিকীতে লেখালেখি শুরু করি। 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : অনিবার্য রাষ্ট্রের কাছে দ্রোহের আলাম' শিরোনামে প্রথম বড় লেখাটি লিখি। 'জুম-পাহাড়ের জীবন' বইতে লেখাটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখালেখির একটা লক্ষ্য ছিল লারমার গণপরিষদ বক্তৃতা আর সংবিধান বিতর্কগুলো জনপরিসরে হাজির করার ভেতর দিয়ে সাংবিধানিক বহুত্ব -বাদের বয়ানকে জীবন্ত রাখা।

> কল্পনা চাকমা অপহরণকে প্রতীক হিসেবে নিয়ে দেশব্যাপি আদিবাসী নিপীড়ন ও বঞ্চনার প্রশ্ন এবং প্রতিরোধের স্মৃতিকে গ্রাফিতির বিষয় করা হয়েছে। কল্পনা চাকমার প্রতিকৃতি, ঐতিহ্যবাহী চাকমা পোশাক, পাহাড়, জুমচাষ, পাহাড়ের পটভূমি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্লুং বাঁশী হাতে আদিবাসী, ফং ও রাও পানির পাত্র, বাঁশ, সামরিক শাসনের প্রতীকী উপস্থাপন এঁকে লেখা হয়েছে, 'কল্পনা চাকমা কোথায়', 'জাস্টিস ফর কল্পনা চাকমা', 'মিসিং নট ফরগটেন', '১৯৯৬-২০২৪: বিচার কোথায়', পাহাড় সেনাশাসন কেন' ইত্যাদি। 'আদিবাসী পরিচয়ের স্বীকৃতি', 'ইনডিজেনাস লাইভস ম্যাটার', 'উই আর ইনডিজেনাস', 'পাহাড় বাঁচাও', 'বন বাঁচাও', 'ল্যান্ড ইজ লাইফ', 'প্রকৃতি বাঁচাও', 'পরিবেশ রক্ষা কর' এসব গ্রাফিতির ভেতর দিয়ে কেবল আদিবাসী আত্মপরিচয় নয়, প্রকাশিত হয়েছে প্রাণ-প্রকৃতি ঘিরে আদিবাসী জীবনের বিশ্ববীক্ষা ও দার্শনিকতা।

লারমার বহুত্ববাদকে বোঝার জন্য মাওরুম নামের এক গুম হওয়া গ্রামের খুঁজে পাহাড়ে যাই। রাঙামাটি থেকে খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা থেকে পানছড়ি। চাকমা ও ত্রিপুরা বৈদ্যদের কাছে তখন পাহাড়ি উদ্ভিদবিদ্যার তালিম নিচ্ছি। পানছড়ির মঞ্জুআদামে, জানতে পারি লারমার নামেই এই গ্রামের নতুন নাম হয়। তাঁর ডাক নাম ছিল মঞ্জু। জাতীয়তা, আত্মপরিচয়, শ্রেণিপ্রশ্ন, কৃষি ও উৎপাদনব্যবস্থা, জুম, নিম্নবর্গ, জেন্ডার, ভূমিপ্রশ্ন, দারিদ্র্য কিংবা কাঠামোগত বৈষম্য বিষয়ে লারমার গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাগুলো ধারাবাহিক আলাপচারিতায় জারি রাখবার চেষ্টা করেছি। রাষ্ট্র বিনির্মাণ ও সংবিধান প্রশ্নে লারমার সেইসব বয়ান এই সময়ের জন-আকাঙ্ক্ষাকে পাঠ করতে জরুরি নোক্তা হতে পারে। লারমার উত্থাপিত অমীমাংসিত রাজনৈতিক জিজ্ঞাসাগুলো আবারো স্মরণ করিয়ে দিতেই চলতি আলাপখানি এক নিদান সূত্রধর হিসেবে হাজির হচ্ছে।

আলাপখানিকে চাঙমা *বেইনে* (তাঁত) বস্ত্রবয়নের দুটি মৌলিকভাগের মতো দুটি পর্বে বিন্যস্ত করছি। আলাম বা বুননের ভিত্তিমূল ব্যাকরণকে সংবিধান হিসেবে পাঠ করছি, যেখানে জনআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। একটা ইনক্লুসিভ বহুত্ববাদী *পিনন* বা *হাদি* (চাকমা তাঁতবস্ত্র) বয়নের জন্য চাবুগি বা ফুলজমিনকে রাষ্ট্রের ধারাবাহিক বিনির্মাণ তৎপরতা হিসেবে আলাপের দ্বিতীয় ভাগে রেখেছি।

আত্মপরিচয় ও 'জাতীয়তা বিতর্ক'

মুক্তিযুদ্ধের পর, স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় পৃথিবীর এক প্রাচীন পত্রঝরা বনে। মধুপুর শালবনের দোখোলা ফরেস্ট বাংলো থেকে রচয়িতাগণের সাথে আশেপাশের মান্দি ও কোচ আদিবাসীদের আলাপ হয়েছে। ১৯৬২ সালে বনের আদিবাসী সভ্যতাকে অস্বীকার করে এই বনকে সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়, তখন আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদ-লিপিতে তারা লিখেছিলেন, 'আমরা মধুপুর বনের আদিবাসী জনগণ'। ১৯২৫, ১৯৪৪ দেশে 'আদিবাসী' পরিচয়ে স্কুল তৈরি হয়েছে। সেসব এখনো জনপ্রমাণ হিসেবে টিকে আছে। যাহোক মধুপুর শালবনের আদিবাসী অঞ্চলে সংবিধান রচিত হলেও, প্রথম থেকেই সংবিধানে আদিবাসী আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করে এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রবল জাত্যাভিমান। একতরফাভাবে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক পরিচয় নির্ধারিত হয় 'বাঙালি'। মানবন্দ্রে নারায়ণ লারমা জাত্যাভিমানী এই



প্রবণতাকে প্রশ্ন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রথম জাতীয়তা বিতর্কের কাঠামোগত জিজ্ঞাসা হাজির করেছেন। লারমা দেশের সকল জাতিসত্তার আত্মপরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে প্রথম 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' ধারণা দেন। রাষ্ট্রীয় নাগরিকতার প্রশ্নে লারমার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ একইসাথে বহুত্ববাদের অন্তর্ভূক্তি।

১৯৭২ এবং পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় ২০১১ সালেও আদিবাসী-আত্মপরিচয়ের তর্ক ওঠেছিল। দুটি সময়েই সংবিধান কমিটির রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর 'আদিবাসী আত্মপরিচয়কে' কীভাবে বাঙালি জাত্যাভিমান দিয়ে অস্বীকার করেছেন তার কিছুটা প্রমাণ দেখা যাক। ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্কে তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বলেছিলেন, ...একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?[১] ৪০ বছর পর একই নেতা জাতীয় সংসদে ২০১১ সালে আদিবাসী জনগণকে সংবিধানে 'উপজাতি' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। ২০১১ সালের ৮ জুন সংশোধনী প্রতিবেদন সংসদে পেশকালে তিনি বলেন, ...মাননীয় স্পীকার, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন উপ-জাতিসহ অন্যান্য জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নাগরিক রয়েছে। তাদের আঞ্চলিক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকশিত করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে[২]। পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়, ...রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৩] সংবিধানে 'আদিবাসী' শব্দটি নাই, একইসাথে 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' বলতেও কোনো শব্দ নাই। কিন্তু রাষ্ট্র তার বহু প্রতিষ্ঠান, আইন, নথি এবং প্রকল্পে সর্বদাই 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' এই অসাংবিধানিক শব্দটিই প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহার করেছে। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' এ 'আদিবাসী' শব্দটি আছে এবং আইনে তফশিলভুক্ত দেশের আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' বলেছে।

এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো আদিবাসী আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তর্ক-জিজ্ঞাসাগুলো কি ছিল? স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের একটি নিজস্ব আইন পরিষদ, ১৯০০ সালের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা, রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত ছাড়া কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না করা এই চারটি দাবি লারমা ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের কাছে পেশ করেছিলেন। আত্মপরিচয় ও জাতীয়তা বিষয়ে ১৯৭২ সালের গণপরিষদের তৎকালীন বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (সূত্র উল্লেখসহ বানান এবং বাক্য অবিকল রাখা হয়েছে) আমরা চলতি আলাপে তুলে ধরছি।

শ্রী লারমা: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না। (লারমার পরে) জনাব এনায়েত হোসেন খান বলেন)

জনাব এনায়েত হোসেন খান এডভোকেট (বাখেরগঞ্জ-৯): ...এটা একটা আইন সভা নয়, এটা একটা গণপরিষদ, সুতরাং এখানে কোন এলাকা ভিত্তিক আলোচনা চলতে পারে কিনা। এ সম্বন্ধে আপনার কাছে রুলিং চাই।[৪]

মাননীয় স্পীকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাধা দিচ্ছেন। যার ফলে আমি আমার .....

জনাব ডেপুটি স্পীকার: আপনাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই। আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য[৫]

শ্রী লারমা : বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্ত্বার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা -- পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাক্‌মা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো,

১. দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় ঃ সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

২ দেখুন: নবম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট। জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, জুন ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ.৫

৩ দেখুন: ধারা-২৩ ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। পঞ্চদশ সংশোধনী, সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

৫ প্রাগুক্ত



খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে (যদিও লারমা তঞ্চংগ্যা, রাখাইন, অসমীয়া, গোর্খা কিংবা সাঁওতালদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন!)। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই।

জনাব নূরুল হক: মাননীয় সদস্য বলেছেন, সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কোন কথা নাই। আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আর্কষণ করে বলতে চাই, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তি দানের কথা আছে। মাননীয় সদস্য ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রী লারমা: আমরা করুণার পাত্র হিসাবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসাবে। তাই মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।

মিসেস সাজেদা চৌধুরী: বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, এই সংবিধানে তাদের উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি বলব, তারাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সঙ্গে তাদেরও একটা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে না পাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে[৬]।

জনাব আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক:

> "৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

৬ প্রাগুক্ত

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালোভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে লেখা পড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙ্গালী। আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙ্গালী বলে পরিচিত করতে চায়।

জনাব স্পীকার: আপনি কি বাঙ্গালী হতে চান না?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙ্গালী বলে মনে করি না। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙ্গালী বলে নয়[৭]।

..... (সংশোধনী পাশ হয়ে যায়) .....

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহিত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

.....(অতঃপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান) .....

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্পমন্ত্রী): ..... আমি পরিষদের তরফ থেকে দাঁড়িয়েছি। কারণ, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বাবু শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই পরিষদে আর ঘটে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তারা বাঙ্গালী।

৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), খন্ড ২ সংখ্যা ১৩। মঙ্গলবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২



তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অঙ্গ বলে আমরা মনে করি। কালকে আমাদের আইন-মন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি দীর্ঘ দিন যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সংসদীয় আইনের আওতা এবং বাইরের সভ্য জগতের আইনের আওতার বাইরে রেখে বিচ্ছিন্ন মনোভাবের সুযোগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল। আমরা তা চাই না, আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙ্গালী জাতির গর্ব হিসাবে থাকবে। আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যথা দেওয়া হবে।

পরিচয় এক সতত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অভিধা। পরিচয় নির্মাণ-বিনির্মাণের রাজনীতি, অধিপতি রাষ্ট্রের উপস্থাপনের ক্ষমতা ও বাহাদুরি সর্বদা নিম্নবর্গের আত্মপরিচয়কে অপর ও আড়াল করে। একটা সময় পাঠ্যবইতে রাষ্ট্র লিখেছিল, সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, পিঁপড়া ও মদ। দেশব্যাপি বহু আদিবাসী স্থাননাম জোর করে বদলে দেয়া হয়েছে। অধিপতি বয়ানে আদিবাসী জাতিগত নামগুলোও বদলে যায়। ১৯৭২ সনের গণপরিষদসভায় তৎকালীন স্পীকারকে দেখা গেছে কোনো বাঙালি সাংসদের নাম ভুলভাবে বা বিকৃত করে উচ্চারণ করেননি, একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাড়া। এটি হয়তো মাননীয় স্পীকারের কোনো 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দোষ বা রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়', কিন্তু এই ব্যবহার ও চর্চা স্পষ্ট করে তুলে রাষ্ট্রের জাতি-ক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র ও বৈষম্যমূলক মনস্তত্ত্ব। এটি বঞ্চনার শর্ত আরোপ করে এবং নিপীড়নের নির্ধারণকে চূড়ান্ত ও বৈধ করে। আর এই বৈষম্য উপনিবেশিকতাকেও মূর্ত করে, কারণ কিভাবে কাউকে ডাকা হয় এবং কী নামে ডাকা হচ্ছে তা উপনিবেশিক ঐতিহাসিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সচরাচর দেখি রাষ্ট্রে কোনো বাঙালি মুসলিম পুরুষের নামকে ভুলভাবে উচ্চারণ কিংবা নথিভূক্তরণের কী বিপদ! সচরাচর এক্ষেত্রে সকলেই সাবধান থাকে বা থাকতে হয় বা এই সাবধানতার নামই 'জাত্যাভিমান'। আসুন আমরা ১৯৭২ সনের ২৫ অক্টোবরের একটি গণপরিষদ বিতর্ক[৮] থেকে সেটি দেখে নিই:

জনাব ডেপুটি স্পীকার : ..... এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বার বার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয় বয়ান পরবর্তীতে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ডিসকোর্স হয়ে ওঠে। যা জাতিরাষ্ট্রের জাত্যাভিমানকে প্রশ্ন করবার কায়দা ও প্রমাণ জারি রাখে। দেখা গেছে, গত ৪০ বছরে 'আদিবাসী আত্মপরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি' দেশের আদিবাসী অধিকার সংগ্রামের প্রধান দাবি হয়ে ওঠেছে। যা কোনোভাবেই 'বাঙালি-বাংলাদেশী' বাইনারি দিয়ে কেবলমাত্র পাঠ করা যায় না। সকল জাতির আত্মপরিচয়কে স্পষ্টভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি তোলার ভেতর দিয়ে লারমা সংবিধানের বহুত্ববাদী চেহারাকে সামনে এনেছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থানেও লারমার বহুত্ববাদী আকাঙ্ক্ষাই দেশব্যাপি জনআকাঙ্ক্ষার গ্রাফিতি হয়ে ওঠেছিল।

কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থা, জেন্ডার, পরিবেশ, কাঠামোগত বৈষম্য, উন্নয়ন, প্রান্তিকতা প্রশ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জিজ্ঞাসাগুলো আমরা এখন আলাপের দ্বিতীয় এবং শেষপর্বে হাজির করবো। এসব জিজ্ঞাসা আমাদের রাষ্ট্রের বহুত্ববাদী চেহারার বিনির্মাণ তৎপরতাকে সক্রিয় করতে আওয়াজ তুলতে পারে।[৯]

বিনাশী উন্নয়ন কর্তৃত্বকে প্রশ্ন

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বা ভারত কী বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে? ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কিংবা তিস্তার পানিবন্টন নিয়েই মূলত আমরা ট্রান্সবাউন্ডারি জাস্টিস বিষয়ে পাবলিক তৎপরতা দেখি। কিন্তু কোনো প্রবাহমান নদীর উজান কী ভাটিতে বাঁধ-ব্যারেজ বা যেকোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণে কোনো পরিসর ও বর্গের অবস্থানই স্পষ্ট নয়। তারপরও ধরে নিচ্ছি বৃহৎবাঁধের বিরুদ্ধেই আমাদের অবস্থান। সুন্দরবনে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎপ্রকল্প বা ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধেও আমরা লড়েছি।

তাহলে একটা সরল প্রশ্ন করা যাক, কাপ্তাই বাঁধ নিয়ে আমাদের অবস্থান ও তৎপরতা কী? ফারাক্কা বা টিপাইমুখ লংমার্চের মতো কোনো লংমার্চ আমরা কাপ্তাই নিয়ে দেখিনি। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কর্তৃত্বের বিরোধীতার মাধ্যমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই প্রথম বিনাশী উন্নয়নকে প্রশ্ন করেছিলেন। বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এখানেও লারমাই প্রথম প্রাণ-প্রকৃতি প্রশ্নে আমাদের বিনাশী উন্নয়নকে প্রশ্ন করতে শেখান। কাপ্তাই বাঁধের এই রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে প্রশ্ন করে লারমা 'ইকোসাইড' বা পরিবেশ-গণহত্যার প্রশ্নকে হাজির

৮ প্রাগুক্ত। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা।। খন্ড ২ সংখ্যা ১৭। শনিবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৩ ইং



করেন। একইসাথে এই অবস্থান উন্নয়নের 'অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক' বাহাদুরিকে প্রশ্ন করে। লারমার এই অবস্থান প্রবলভাবে মানুষকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে।

কারণ লাখো মানুষ আর অগণিত বুনোপ্রাণ উচ্ছেদ হয়েছিল এই কাপ্তাই ড্যামের কারণে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬১ সাল থেকেই বাঁধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন বিশাল পাহাড়ি ছাত্র সমাবেশ। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি পান। কাপ্তাই-ড্যাম পাহাড় জুড়ে যে উন্নয়ন-ট্রমা বহাল রেখেছে সেই সুরাহা আজো হয়নি। সেই উন্নয়ন-কর্তৃত্বের ন্যায়বিচার না হওয়ায়, রাষ্ট্রের উন্নয়নচিন্তা সেই হেজিমনি দ্বারাই জায়েজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। লারমা সংসদে কেন বলেছিলেন, একটি বাঁধ ঐ অঞ্চলের মানুষের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে সেই আলাপ আজ বিশ্বব্যাপি পরিবেশ ও জলবায়ু ডিসকোর্সের ন্যায্যতার অবয়ব গড়ে তুলছে।

শ্রী লারমা: যে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে সেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনো শেষ হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ ঐ এলাকার মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এ বাঁধের এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি।

কৃষি, জুম ও ভূমিপ্রশ্ন

লারমা বলেছিলেন, ... রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, দেশরক্ষা এবং তারপর হচ্ছে শিল্প। কৃষি এবং জুমের সাথে উৎপাদন ও মালিকানার সম্পর্কের রাষ্ট্রীয় আইনগত মনোযোগ স্পষ্ট করার আহ্বান জানান লারমা। দেশের প্রথম বাজেট আলোচনায় লারমা কৃষকের জায়গা থেকে প্রশ্ন করেন। কৃষিজমির সমবায় মালিকানা ও বন্টন এবং কৃষিজমির সংস্কার, রাজস্ব, খাজনা এবং কৃষিজমির আইন ও নীতি বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লারমা। রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ত্ব ও ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। লারমা তার জীবনকালে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের জুমচাষের বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে সর্বদা তৎপর ছিলেন।

১৯৬৬ সালে দীঘিনালায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময়েও তিনি স্থানীয় জুমিয়াদের এ বিষয়ে সময় দিয়েছেন। দীঘিনালার ভৈরফা গ্রামে কয়েক বছর গবেষণার সুবাদে প্রবীণদের কাছ থেকে জানতে পারি খুকিবিনি, হাইরেনাচন বিনি, মনভোগবিনি, কালা খবরক, সাদা খবরক, লাল গ্যাল্লং, সাদা গ্যাল্লং, চিকন গ্যাল্লং, গুড়ি গ্যাল্লং, রাঙাপানি, চানমনি, হাল্যোজিরে, লুদিসেল, সিনেল, গজ্যা, গঞ্জালি, বাচ্চুপুদি, কামারাং, ছুরির মতো দেশজ জুমধান জাত সুরক্ষায় লারমা জুমিয়াদের সচেতন করতেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের ধানী জমির মালিকানা সমবায়ের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। তার ফলে কৃষক জমির মালিক হবে এবং অধিক ফসল ফলাতে যত্নবান হবে এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হবে। তাহলে দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে[১০]।

বাংলাদেশের কৃষি ও জুমের আপন সীমানা দখল করেছে কর্তৃত্ববাদী বৈশ্বিক 'সবুজবিপ্লব এজেন্ডা'। কৃষকের ঘর বীজশূণ্য করতে গবেষণা ও বায়োপ্রসপেক্টিংয়ের নাম হরদম দেশীয় জাতগুলো ছিনতাই করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের গবেষণা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি। খাগড়াছড়ির ফকুমার ত্রিপুরা, রাজশাহীর নূর মোহাম্মদ কিংবা ঝিনাইদহের হরিপদ কপালীকে কেন প্রজননবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারলো না রাষ্ট্র? এটি কেবল রেজিমের সমস্যা নয়, বরং প্রবলভাবে টিকে থাকা কাঠামোগত বৈষম্য ও উপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিলের উপর তোলার লারমার জিজ্ঞাসাগুলো রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও মনস্তাত্ত্বিক সংস্কারের বিষয়। রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেশের কৃষক ও গ্রামীণ নিম্নবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে লারমা প্রশ্ন তুলেন। লারমার সতর্কবার্তা রাষ্ট্র পাত্তা দেয়নি, দেখা যায় প্রশ্নহীনভাবে বায়োপাইরেসি ঘটেছে, গবেষণার নামে দেশ-বিদেশের গবেষকেরা দেশি জাত ও জীনবৈচিত্র্য দখল করেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করবো এসব প্রসঙ্গে লারমা কোন ধরনের জিজ্ঞাসা হাজির করেছিলেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য যে বোর্ড করা হয়েছে এখানে যাদের সদস্য করা হয়েছে তারা এদেশের সন্তান হলেও সত্যিকারভাবে মাটির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষাবাদ করে, নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, আজকের এই রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটার দ্বারা বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেখানে তাদের স্থান নাই। যারা সত্যিকারে চাষাবাদ করে, লাঙ্গল ধরে, যাঁরা প্রকৃত মানুষ এই জাতীয় সংসদে তাঁদের মত এমন প্রতিনিধি আছে কিনা জানি না। আমি একজন কৃষকের ছেলে। কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষকের

১০ প্রাগুক্ত



কথাই বলতে চাই। তাই আমি দেখছি যাঁরা কৃষকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে তাঁদেরকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা 'এয়ার-কন্ডিশন' ঘরে আরাম কেদারায় বসে রিসার্চ করবে এখানে কেবল তাঁদেরই নেওয়া হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, আমার দ্বিতীয় সংশোধনী হচ্ছে A representative nominated by the International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines-- এটাকে বাদ দেওয়া হোক। আমি বুঝতে পারি না যে, আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাইরের একটি দেশের লোক কেমন করে এই বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। আমাদের দেশের মাটিতে আমরা গবেষণা করব, আমরাই পরীক্ষা করব এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে সাহায্য নিব, বুদ্ধি পরামর্শ নিব। সেই জন্য আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে 'ডিলিট' করতে বলছি[১১]।

নিম্নবর্গ ও প্রান্তিকতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বার বার দেশের প্রান্তজনের আয়নায় রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছেন, প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। হরিজন, বেদে, ভিখারি, ভবঘুরে, কারখানার মজুর, রিকশাচালক, মেথর, যৌনকর্মী সবার অধিকারের কথা জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন। ১৯৭৪ সনের জাতীয় সংসদে জাতীয় বাজেট বক্তৃতার বিবরণী পাঠ করা যাক। সেসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দেশের প্রথম জনপ্রতিনিধি যিনি বেদেসহ সকল বঞ্চিত মানুষের কথা সংসদে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাদের উন্নয়নে বিশেষ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেদিনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়নি, তখনকার কোনো সাংসদই তাকে সমর্থন করেননি, বরং তিরস্কার করেছিলেন। দীর্ঘসময় পরে বেদে, হিজড়া, দলিতদের জন্য বিশেষ বাজেট ও সুরক্ষাবেষ্টনী প্রকল্প বরাদ্দ দিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে। লারমা জাতীয় সংসদে 'ভবঘুরেদের' বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে ভবঘুরেদের পরিসংখ্যান জানতে চান এবং ভবঘুরেদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য কোনো ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কীনা সেটিও জানতে চান।[১২]

১৯৭৪ সালের ২৮ জুন। জাতীয় বাজেট আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বেদে জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা তুলেন। সেসময় তিনি বলেছিলেন,

... মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, যারা যুগ যুগ ধরে, আবহমান কাল ধরে সমাজে অবহেলিত, সেই বেদের দল, যাদের ঘর-বাড়ি নেই, নৌকার উপর যারা জীবনযাপন করে, এদের প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। বেদের মত যাঁরা মেথর, তাদেরও আজকে কোন অস্তিত্ব নাই। তারা মানুষের মত স্বাধীনভাবে বসবাস করার কি কোনদিন স্বীকৃতি পাবে না? আজকে যারা সমাজে অবহেলিত, তাদের স্থান সমাজে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না[১৩]?

পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব ও মেহনতি মজদুর

বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক ধারা এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে লারমার ভাষ্য জানান দেয় তিনি মেহনতি মজদুরের জন্য সাম্য ও ন্যায্য সমাজ চেয়েছিলেন। মজদুর জনগণের ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহসী উচ্চারণ করেছেন বারবার।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি বলতে চাই যে, মানুষের কথা এই সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। যদি মানুষের কথা এই সংবিধানে না থাকে, তাহলে এই সংবিধান দিয়ে কি হবে[১৪]?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়, তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব, দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব[১৫]?

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি, নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যারা আসবেন, তাদেরও সেই একই করুণ অবস্থা হবে-- যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না।[১৬]

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের শেষ পর্যায়ে এসেছি। আজকের এই

১১ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: BANGLADESH RICE RESEARCH INSTITUTE BILL, 1973, খন্ড ২ সংখ্যা ২১। বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১২ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতক, বিষয়-ভবঘুরে, খন্ড ২, সংখ্যা-৩০, ১৩ জুলাই ১৯৭৪

১৩ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: The Finance Bill, 1974 খন্ড ২ সংখ্যা ১৮শুক্রবার , ২৮শে জুন , ১৯৭৪

১৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২



শেষ দিনে আমাদের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর যে মনের কথা, যে মনের অভিব্যক্তি, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই মহান গণপরিষদে এক পবিত্র দলিলে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি -- যে দলিলে থাকে মানুষের চলার পথের ইঙ্গিত, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, মানব সভ্যতা গড়ে তোলার ইঙ্গিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সংবিধানের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেইসব প্রশ্ন এখানে গৃহীত না হলেও আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরী করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিন রাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, আজ এই সংবিধান যাদের রক্তে এল, তাঁদের কথা যেন ভুলে না যায়[১৭]।

নারীমুক্তি

সংবিধানে 'নারীর জন্য স্পষ্ট কোনো অধিকারের জায়গা নাই' এমন বাহাস তুলেছিলেন লারমা। তিনি উত্থাপন করেছিলেন, ... তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা সংবিধানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।[১৮]

পরিবেশপ্রশ্ন ও প্রকৃতিপ্রেম

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার সাংগঠনিক অনেক কাজে কর্মী ও প্রতিনিধিদের নানাভাবে পরিবেশপ্রশ্নে দায়বদ্ধ হতে তিনি বাধ্য করেছেন, তাদের ভেতর পরিবেশ সুরক্ষার চর্চা গড়ে তুলেছেন। একটা পাহাড়, বনভূমি বা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র থেকে কতখানি প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আহরণ করা জরুরি এই পরিবেশগত নীতিশিক্ষা তিনি চালু করেছিলেন নিজের সংগঠনে। ১৯৬৯-১৯৭১ এর সময় রাঙ্গামাটির কন্ট্রাক্টর পাড়ার শেষ মাথায় একটা বাঁশের বেড়া, শণের ছানি অতি সাধারণ মাটির ঘর ছিল। এই ঘরেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে হাসি মুখে তিনি সকলকে আতিথেয়তা দিতেন। তার ঘরে কোন কাঠের সোফা বা কাঠের চেয়ার ছিল না। অতিথিদেরকে বাজ-দাবা (বাঁশের হুক্কা) আর পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত।[১৯]

ক্ষয়িষ্ণু গ্রাফিতি ও লারমার বহুত্ববাদ

রাষ্ট্রের জন্য এক অন্তর্ভূক্তিমূলক বহুত্ববাদী সংবিধান জরুরি। কৃষক বিদ্রোহ, উপনিবেশ বিরোধী লড়াই, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে এক বহুত্ববাদী জনআকাঙ্ক্ষা বারবার এই ভূগোলে মূর্ত হয়েছে। লারমা সেই বহুত্ববাদকে সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতর থেকে আলাপে তুলেছেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদের জরুরি জিজ্ঞাসাগুলোর ভেতর দিয়ে এটি স্পষ্ট যে, পিনন বা হাদি নামের বস্ত্র বুনতে গেলে প্রথমত আমাদের ইনক্লুসিভ আলাম দরকার। সেই আলাম আমাদের পাড় ও জমিনের বুনন ও নকশা বিস্তারে রূপরেখা দেখাবে। লারমা বার বার স্পষ্ট করেছেন এই আলামে সমাজের সর্বস্তরের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে। সংবিধান হবে সকল বর্গ ও জনের দলিল, এবং কেবলমাত্র মানুষেরও নয়। লারমার বহুত্ববাদের বয়ান এবং গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা প্রমাণ করে ইতিহাস থেকে ইতিহাসে এই প্রবল আওয়াজ জেগে থাকে এবং দুনিয়াকে জাগিয়ে রাখে। ক্ষয়িষ্ণু গ্রাফিতির ভেতর লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদ দাহ ও দ্রোহ নিয়েই জেগে আছে। রাষ্ট্র কী রূপান্তরের দায় ও দরদ বোধ করে?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, শপথ গ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচী যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন পবিত্র কোরান থেকে 'সুরা' পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়েছে। বাংলাদেশে শুধু হিন্দু-ধর্মাবলম্বী বা শুধু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী লোক নাই -- বাংলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ও খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন। কেবল পবিত্র কোরান পাঠ, গীতা এবং ত্রিপিটক পাঠ করা হবে, খ্রীষ্টান-ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন আছে।[২০]

বহুত্ববাদী জনআকাঙ্ক্ষার রক্তদাগের ভেতর দিয়ে বিগত ইন্টেরিম সরকার প্রথম শপথ অনুষ্ঠানে জুলাইয়ের গ্রাফিতি বা লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদকে খারিজ করে আবারো কর্তৃত্ববাদী উপনিবেশিক লিগাসির বাইনারি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইতিহাস ক্ষত ও প্রমাণ নিয়েই আগায়।

---

১৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় সংবিধান-বিল (গৃহীত)। খন্ড ২ সংখ্যা ১৬। শনিবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ ইং

১৮ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৯ দেখুন: চাকমা, বিজয় কেতন। স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ। এই প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। ২০০২, পৃ.১৬

২০ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: বৈধতার প্রশ্নসমূহ খন্ড ১ সংখ্যা ১। শনিবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ইং



মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জীবন ও দর্শন

।। কাঞ্চনা চাকমা ।।

'ইতিহাস' এটি কেবল কোনো তারিখের সমষ্টি নয়। ইতিহাস মূলত কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীর কান্না, জয়-পরাজয়, প্রতিরোধ, অত্যাচার এবং অদম্যভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘতম এক দলিল। সেখানে কোনো কোনো ইতিহাস লেখা হয় রাজপথের রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে, কোনোটি যুদ্ধের ময়দানে, আবার কোনো কোনো ইতিহাস লেখা হয় নিঃশব্দে-পাহাড়ের ঢালে জুম ঘরে, ঝিরি-ঝর্ণার স্রোতে ভেসে যাওয়া কোনো ঘরের স্মৃতিতে, নির্বাক কোনো মায়ের অথবা কোনো বোনের চোখে, কিংবা এমন এক মানুষের হৃদয়ে, যে নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমগ্র একটি জাতিগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। আর সেই নীরব ইতিহাসেরই এক উজ্জ্বল অথচ বেদনাবিধুর অধ্যায়ের নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও দর্শনকে বুঝতে হলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাপ্রবাহের বাইরে গিয়ে সেই সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রথমে বুঝতে হবে। কারণ মানুষ কখনো শূন্যতার মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তক হয়ে ওঠে না। ইতিহাস তাকে নির্মাণ করে, সমাজ তাকে প্রশ্ন করে, আর সময় তাকে উত্তর খুঁজতে বাধ্য করে।

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলার নানিয়াচর উপজেলার মহাপুরম (বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদের নিচে) নামক গ্রামে পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ও মাতা সুভাষিণী দেওয়ানের কোলে জন্ম নেওয়া এম এন লারমা এমন এক ভূখণ্ডে বেড়ে ওঠেন, যেখানে প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্যের পাশাপাশি ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা। পাহাড়ের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের যে জীবন নির্মাণ করেছিল, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্প্রসারণ সেই জীবনকে ক্রমাগত নানা প্রশ্নের মুখোমুখি করেছিল। দেশভাগের অভিঘাত, পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা, ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধের ফলে লাখো জুম্ম নিজ ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুতি, নিজেদের ভূমি অধিকার থেকে খর্ব এবং পরবর্তী সময়ে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নামক নয়া রাষ্ট্র নির্মাণ-এই সবকিছু মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ তথা জুম্ম সমাজের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবন যেন ইতিহাসের দীর্ঘতম প্রান্তরে লিখিত এক অবিরাম সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। যেখানে প্রতিটি পাহাড় একেকটি সংগ্রামের প্রতীক, প্রতিটি বন একেকটি সভ্যতার উত্তরাধিকার, প্রতিটি ঝর্ণা একেকটি জাতিসত্তার প্রবহমান স্মৃতিধারা এবং প্রতিটি জুম জীবনধারণের পাশাপাশি আত্মপরিচয়েরও এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক। সহস্রাব্দের সহাবস্থানে প্রকৃতির সঙ্গে পাহাড়ের জুম্ম জাতি যে জীবনদর্শন নির্মাণ করেছে, সেখানে পাহাড় নিছক ভূ-প্রকৃতি নয়, বন কেবল সম্পদ নয়, ঝর্ণা কেবল জলপ্রবাহ নয় এবং ভূমি কোনো নিষ্প্রাণ সম্পত্তি নয়। এগুলো জুম্মদের অস্তিত্বের সম্প্রসারিত অবয়ব। পূর্বপুরুষের স্মৃতি, সংস্কৃতির আধার, জীবিকার অবলম্বন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে অতীতের এক অন্তঃসলিলা সংযোগ। অতএব, কোনো জুম্ম পরিবার যখন তার ভূমি থেকে উৎখাত হয়, তখন কেবল একটি বসতভিটা কিংবা জুম ভূমি ভৌগোলিক সীমানা বিলুপ্ত হয় না, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ইতিহাসের একটি জীবন্ত অধ্যায়। যখন কোনো ভাষা ক্রমশ প্রান্তিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তখন কেবল কিছু শব্দের বিলুপ্তি ঘটে না—ক্ষয়প্রাপ্ত হয় একটি জাতির পৃথিবীকে উপলব্ধি করার স্বতন্ত্র দার্শনিক পদ্ধতি। আর যখন কোনো সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক আধিপত্যের অভিঘাতে ক্রমাগত প্রান্তিকীকৃত হয়, তখন হারিয়ে যেতে থাকে শুধু কিছু আচার, বিশ্বাস ও উৎসব নয়; ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের অন্তর্গত স্তম্ভসমূহ।

আর যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়—"এই রাষ্ট্রে আমি কে?"—তখন সেই প্রশ্ন আর পরিচয়ের সীমাবদ্ধ প্রশ্ন থাকে না। তা পরিণত হয় অস্তিত্বের প্রশ্নে, মর্যাদার প্রশ্নে, ইতিহাসে নিজের স্থান নির্ধারণের প্রশ্নে জুম্ম সমাজে এমনতর মানবিক বিপর্যয় এম এন লারমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেবল শিক্ষকতা বা আইনজীবী পেশায় থেকে জুম্ম জনগণের অধিকার রক্ষা সম্ভব নয়। তাই তিনি শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেন, ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান, ১৯৬০ সালে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগদান এবং ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় দুই বছর কারাভোগের পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ চট্টগ্রাম কারাগার থেকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্তির পরপরই তিনি জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের কাছে "শিক্ষা গ্রহণ কর, গ্রামে ফিরে চলো"—স্লোগান তুলে ধরেন। যা ছিল



একটি সম্পূর্ণ সামাজিক দর্শন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শতাব্দী প্রাচীন প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত সমাজের শাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিদ্রামগ্ন সমাজে ব্যাপক শিক্ষা প্রসার না ঘটলে জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সাধারণের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষিত যুব সমাজের অনেকেই গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। এম এন লারমা নিজেও ১৯৬৬ সালে দীঘিনালা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি যখন আপন জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য হারাতে চলেছিল, উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার যখন জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটার পর একটা হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো ঠিক সেই সময়ে ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত করে রাজনৈতিক অঙ্গনে পাকাপোক্তভাবে আবির্ভূত হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)। ঠিক এমনি সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধে এম এন লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সুকৌশলে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করলো কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তিত হলো না। শুরু হলো উগ্র বাঙালি মুসলমান জাতীয়তাবাদের নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন। মুক্তিবাহিনী ও সরকারি বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হলো অক্ষম ও দুর্বল জনগণ। বহু ঘরবাড়ি পুড়ে ছাঁই করে দিল; শত শত মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করে দিল; রাইফেলের গুলিতে হত্যা করলো শত শত লোককে। কত অশ্রু ঝরলো বুকে। এইভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, হত্যা, ডাকাতি, লুটতরাজ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল। তখন জুম্ম জাতিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও সচেতন জুম্ম সমাজ। সমাজ ও দেশ রক্ষার ডাক দিলেন এম এন লারমা।

১৯৭৩ সাল। শুরু হলো জুম্মদের নিয়মতান্ত্রিক লড়াই। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন হলো। বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন এম এন লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল থেকে। শুরু হলো অধিবেশন যথা নিয়মে। এই অধিবেশনে জুম্ম জনগণের একমাত্র আশা ভরসার গণপ্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার ঐতিহাসিক ভাষণে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের বাঁচার দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি দাবি জানালেন জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। তিনি আবেগময়ী ও অনলবর্ষী ভাষায় তুলে ধরলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের কথা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা জাতিসত্তার কথাও দাবি করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারও বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জন্য ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে, সুতরাং জুম্ম জনগণের শোষণ ও বঞ্চনার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, যে বাঙালি অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই বাঙালি শাসকরাই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলো। উগ্র বাঙালি মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হয়নি। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক কলমের খোঁচাতেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করলো—বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই 'বাঙালি' নামে পরিচিত হবে। আজীবন সংগ্রামী গণপ্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংবিধানের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। তিনি সংযত ও দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন 'একজন বাঙালি কোনদিন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপ একজন চাকমাও বাঙালি হতে পারে না'—এই বলে তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

এই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিষ্ঠা করেন জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস)। তিনি ছিলেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। এই সংগঠনে তিনি জুম্ম জনগণের প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক অংশকে যুক্ত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সফলভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে একত্রিত করে 'জুম্ম' নামক একটি সামগ্রিক পরিচয়ের অধীনে সংগঠিত করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা—পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে দেশের রাজনীতি নানা মোড় নিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ রুদ্ধ হয় যায়। যার ফল স্বরূপ জুম্মদের অধিকার আদায়ের জন্য শুরু হয় সশস্ত্র আন্দোলন। যার লক্ষ্য জুম্ম জাতির মুক্তি ও স্ব-শাসন অর্জন। ফলে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গড়ে উঠে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা 'শান্তিবাহিনী'। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও মিলিশিয়া বাহিনী।



শান্তিবাহিনী গঠনের পেছনে ছিল জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার এক মর্মন্তুদ আকুতি। যখন শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো জুম্মদের স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হলো, যখন সেনা মদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভূমি দখল করতে লাগলো, যখন সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনাচার হুমকির মুখে পড়ল, তখন শান্তি বাহিনী হয়ে উঠল জুম্মদের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়। এটি কেবল একটি সামরিক সংগঠন ছিল না, এটি ছিল জুম্ম জনগণের আত্মমর্যাদা, তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামের প্রতীক। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মনোবল ও বিচক্ষণ সামরিক দক্ষতা দেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মনে তখন ত্রাসের সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশে বিদেশে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের কথা, শান্তিবাহিনীর বীরত্বের কথা প্রচার হয়েছিল।

ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম পরিহাস সম্ভবত এই যে—যাঁরা একটি জাতির অনাগত ভবিষ্যতের স্থাপত্য নির্মাণে নিজেদের জীবন, স্বপ্ন ও অস্তিত্বকে নিঃশেষিত করে দেন, তাঁদের অধিকাংশই সেই নির্মিত ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ প্রভাত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন না। তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন সময়ের এক দুর্বোধ্য সন্ধিক্ষণে-একদিকে ঘনীভূত অন্ধকারের অনিবার্যতা, অন্যদিকে অনাগত সূর্যোদয়ের ক্ষীণ অথচ অবিনাশী সম্ভাবনা। তাঁরা জানেন, যে ভোরের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করছেন, হয়তো তার আলো তাঁদের চোখে এসে পৌঁছাবে না। তবু তাঁরা পথ নির্মাণ করে যান।

একদিন তাঁদের দেহ মিশে যায় মৃত্তিকার আদিম নৈঃশব্দ্যে কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন মাটির নিচে সমাহিত হয় না। বরং তা আশ্রয় নেয় মানুষের সমষ্টিগত স্মৃতিতে, জাতিসত্তার অন্তর্লীন চেতনায়, প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত আকাঙ্ক্ষায়। মৃত্যুর পর তাঁদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলেও তাঁদের উচ্চারিত প্রশ্নগুলো স্তব্ধ হয় না বরং সময়ের পরিক্রমায় সেগুলো আরও অনিবার্য, আরও তীক্ষ্ণ এবং আরও উচ্চসিত হয়ে ফিরে আসে। কখনো কখনো একজন মানুষের শারীরিক অনুপস্থিতিই তাঁর ঐতিহাসিক উপস্থিতিকে এমন এক গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত করে, যেখানে মৃত্যু আর সমাপ্তির প্রতিশব্দ থাকে না-বরং হয়ে ওঠে উত্তরাধিকার সৃষ্টির এক অনিবার্য পর্ব।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সেই বিরল ঐতিহাসিক সত্তাগুলোর অন্যতম—যাঁর জীবনকে কেবল একজন রাজনৈতিক নেতার জীবন বলে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন এক সংকটবিক্ষুব্ধ সময়ের রাজনৈতিক মনন, এক বিপন্ন জাতিসত্তার আত্মপরিচয়-অন্বেষণের প্রতীক এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক ভাষায় রূপান্তরিত করার এক অনন্য প্রয়াসের প্রতিভূ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল কেবল ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন নয় ছিল অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আত্মপরিচয়ের মর্যাদা, রাজনৈতিক অধিকার এবং নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আকাঙ্ক্ষা। ফলে তাঁর সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন কোনো রাজনৈতিক অধ্যায় হিসেবে পাঠ করলে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বরং তা পাঠ করতে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহাসিক বঞ্চনা, জাতিসত্তাগত সংকট, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং আত্মপরিচয়ের অস্তিত্ববাদী অভিঘাতের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে।

শুধু তাই নয় জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষদের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির মহান প্রয়াসে অধিকার সচেতন করে সংগঠিত করার রাজনৈতিক তাগিদ অনুভবও করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন—সমাজের অর্ধেক অংশই নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অধিকার সচেতন করে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে জাতীয় মুক্তি ত্বরান্বিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে একমাত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমেই প্রকৃত নারী মুক্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অতএব, তিনি জুম্ম নারীর মরণ ফাঁদ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনসহ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম নারী সমাজকে সামিল করার মহান উদ্যোগে প্রয়াস করেন। আর এই কারণেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। বরং তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর রেখে যাওয়া প্রশ্নগুলো যেন আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে পাহাড়ের কুয়াশার মতো প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর, ভোররাত। সেই এক হৃদয়বিদারক, বিভীষিকাময় ঘটনা, উদ্বেলিত হৃদয়ের রক্তকণিকা খসে পড়া একটি মুহূর্ত। এক গভীর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সময়ে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের (গিরি-ভবতোষ দেওয়ান, প্রকাশ-প্রীতি কুমার চাকমা, দেবেন-দেবজ্যোতি চাকমা ও পলাশ-ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) সশস্ত্র হামলায় জুম্ম জাতি নিজেদের উজ্জ্বলিত নক্ষত্রকে হারিয়ে ফেলে। খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার খেদারাছড়া থুমে সংঘটিত সেই হত্যাকাণ্ড শুধু একজন রাজনৈতিক নেতার জীবনাবসান ছিল না। এটি ছিল একটি আন্দোলনের অন্তঃস্রোতে সঞ্চিত আদর্শিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক বিভাজন এবং ক্ষমতার অন্তর্গত সংঘাতের এক রক্তাক্ত বহিঃপ্রকাশ।

লারমার জীবনাবসানের সেই মুহূর্তটি তাই ইতিহাসের কাছে নিছক একটি তারিখ নয়। বরং এটি একটি যুগের অন্তর্দহনকে ধারণ করে থাকা এক প্রতীকী ক্ষতচিহ্ন-যেখানে বহিরাগত রাজনৈতিক প্রতিকূলতার পাশাপাশি জুম্মদের আন্দোলনের



অভ্যন্তরীণ বিভাজনও তার নির্মম অভিঘাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কারণ যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী প্রবণতা কোনো একক মুখাবয়ব নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। ইতিহাসের প্রতিটি সংকটপর্বে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবর্তন করেছে ভাষা, পরিচয় ও রাজনৈতিক অভিধা। কখনো তারা বিপ্লবী সংগ্রামের মুখোশ ধারণ করেছে; কখনো আত্মপ্রকাশ করেছে অতিশয় দেশপ্রেমিকের অবয়বে; কখনো নিজেদের বাস্তববাদী, প্রগতিশীল কিংবা পরিস্থিতিসচেতন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছে; আবার কখনো উগ্র জাতীয়তাবাদের আবরণে নিজেদের আপস, বিচ্যুতি ও সুবিধাবাদকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অতএব, কোনো মুক্তিকামী আন্দোলনের ইতিহাস কেবল বহিরাগত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘটিত সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নয়। তার অন্তর্গত মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের সংকট, রাজনৈতিক বিচ্যুতি, সুবিধাবাদী প্রবণতা এবং আপসকামিতার বিরুদ্ধেও তাকে নিরন্তর আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়গুলোর একটি নিহিত ছিল এই দ্বিমুখী প্রতিকূলতার মধ্যেই। একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে নিরন্তর সংঘাত, অন্যদিকে আন্দোলনের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল, বিভেদমুখী ও সুবিধাবাদী প্রবণতার উত্থান—এই দ্বৈত অভিঘাতের মধ্য দিয়েই তাঁকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথ নির্মাণ করতে হয়েছিল। একদিকে ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধের প্রাচীর অন্যদিকে ছিল অন্তর্গত বিভেদের অন্ধকার। একদিকে বহিরাগত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, অন্যদিকে গৃহশত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করা সুবিধাবাদী প্রবণতা। এই দ্বিমাত্রিক প্রতিকূলতার মধ্যেও লারমা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক দূরদর্শিতা ও আদর্শিক দৃঢ়তার মাধ্যমে আন্দোলনকে একটি সুসংহত রাজনৈতিক অভিমুখ প্রদানের প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য। তাই তাঁর সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অস্তিত্বগত, সাংগঠনিক এবং আদর্শিক, বহির্মুখী প্রতিরোধ এবং অন্তর্মুখী আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম। আর এখানেই লারমার মৃত্যুর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত।

একজন মানুষকে হত্যা করা যায়, তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায়, তাঁর সংগঠনকে বিভক্ত করা যায়, তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে বিকৃত করার চেষ্টা করা যায়—কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন বঞ্চনা, আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নকে হত্যা করা যায় না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ক্ষেত্রেও ইতিহাস সেই অমোঘ সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর দেহ মাটির কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে; কিন্তু তাঁর প্রশ্নগুলো মাটির সঙ্গে সমাহিত হয়নি। বরং সেগুলো পাহাড়ের বাতাসে, নদীর স্রোতে, বনভূমির নৈঃশব্দ্যে এবং মানুষের স্মৃতির অন্তর্গত স্তরে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনির মতো বেঁচে থেকেছে। সময়ের পরিবর্তনে সেই প্রশ্নের ভাষা পাল্টেছে, রাজনৈতিক বাস্তবতার বিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে, প্রজন্ম বদলেছে; কিন্তু আত্মপরিচয়, অধিকার, মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসের অন্তঃসলিল স্রোতের মতো বহমান থেকেছে।

সম্ভবত এটাই ইতিহাসের গভীরতম ব্যঙ্গ—যাঁরা ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমানকে বিসর্জন দেন, তাঁরা প্রায়শই ভবিষ্যতের পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের অসমাপ্ত স্বপ্নই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক ধরনের নৈতিক ঋণ হয়ে থাকে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও সেই ঋণ রেখে গেছেন। তিনি হয়তো সেই পূর্ণাঙ্গ প্রভাত প্রত্যক্ষ করতে পারেননি, যার সম্ভাবনাকে তিনি অন্ধকারের ভেতর থেকে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের কিছু মানুষ সূর্যোদয় দেখার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না; তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন সূর্যোদয়ের পথ নির্মাণ করার জন্য। তাই লারমার মৃত্যু একটি জীবনের সমাপ্তি হলেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অন্ত্যেষ্টি নয়; বরং তা এক অসমাপ্ত ইতিহাসের সূচনাবিন্দু। তাঁর হত্যাকাণ্ড একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটালেও তাঁর উচ্চারিত প্রশ্নগুলোর কোনো সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে পারেনি। কারণ ইতিহাসের কিছু প্রশ্ন রক্তে লেখা হয়—আর রক্তে লেখা প্রশ্ন সময় যতই পেরিয়ে যাক, সহজে মুছে যায় না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই অমোচনীয় প্রশ্নেরই এক নাম। এই জটিল বাস্তবতার মধ্যেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক চেতনার জন্ম। যা পাহাড়ের বুকে একদিন আলো হয়ে জ্বলে উঠেছিল, যে আলো কোনো ব্যক্তির জীবনাবসানে নিভে যায়নি। সেই আলো কোনো প্রদীপের আলো ছিল না। তা ছিল চেতনার আলো। আর চেতনার আলোকে হত্যা করা যায় না। তাঁর শরীর মাটিতে মিশে গেছে কিন্তু তাঁর স্বপ্ন এখনও পাহাড়ের আকাশে ঝুলে থাকা এক অসমাপ্ত ভোরের মতো। যার আলো দেখা যায়, অথচ যার পূর্ণ সূর্যোদয় এখনও ইতিহাসের অপেক্ষায়।

> “দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।”
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*



পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রাসঙ্গিকতা

।। উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন[১] ।।

সূচনা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চলে বৃহত্তর বাঙালি ছাড়াও এখানে ১৪টি সংখ্যালঘু জাতি স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশ সংবিধানে তাদেরকে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার অন্যতম কারণ হল সংখ্যাল্পতা ও বাঙালির কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি ও চিন্তাধারা। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পাকিস্তান আমলে জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি সেখানে আধুনিক শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল অনেক পরে যার অন্যতম কারণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই শাসকগণ নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য চায়তো না যে সাধারণ প্রজারা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। অথচ তারা নিজেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।

এখানকার নদী, ঝর্ণা, পাহাড় ও বনাঞ্চল-ই অঞ্চলটিকে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে কিন্তু স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গঠিত হলেও ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এখানে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। তবে অল্পসংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনামলে যা ছিল মূলত শাসক শ্রেণি ও ধনী পরিবারের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল হলো 'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল'; যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চন্দ্রঘোনায় ১৮৬৩ সালে। হাচিনসনের মতে, তখন এই বোর্ডিং স্কুলে প্রায় ৫০ জনের মত আদিবাসী ছাত্র ছিল, যারা সেখানে থেকে পড়াশুনা করত এবং সরকার তাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বার্থের কথা না ভেবে এবং জনমত যাচাই না করেই রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করে যার সমাপ্তি হয় ১৯৬০ সালে। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধের পরেও অনেক আদিবাসী বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না।

কাপ্তাই বাঁধের কারণে মানুষের উপর সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব এবং তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সামন্ত নেতৃত্বের অপারগতার কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন পাহাড়ি জনগণদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষালাভের বিকল্প নেই। মূলত ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের পর সবাই সচেতন হয়ে একসাথে শিক্ষা গ্রহণের যে চেতনা তা বৃদ্ধি পেয়েছিল; তারা ভেবেছিল যে, লেখাপড়া করতে হবে, কেননা তাদের আর পূর্বের মত করে থাকার অবস্থা নেই। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালের দিকে লারমার সাথে একত্রিত হয়ে অন্যান্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ অনেক অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যেন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেসকল ছাত্ররা কলেজে পড়াশুনা করত তারাও নিজ নিজ গ্রামের স্কুলগুলোতে তখন শিক্ষকতা করত, বাবা-মা'কে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে উৎসাহ প্রদান করত। ফলে সমাজের মধ্যেই তখন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিচয়

রাঙ্গামাটি শহর থেকে কিছুটা দূরে মহাপুরম (মাওরুম) নামক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের সদস্যরাই ছিলেন সংস্কৃতিবান। তার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর চাকমা, যিনি ছিলেন মহাপুরম জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি একাধারে ছিলেন মানবতাবাদী, সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তিনি চেয়েছিলেন সামন্তবাদে নিমজ্জিত ও পশ্চাৎপদ জুম্ম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। মাতার নাম সুভাষিনী দেওয়ান, যিনি ছিলেন স্নেহময়ী ও ধর্মানুরাগী। তিনিও পড়াশুনা পছন্দ করতেন। তৎকালে তাদের বাড়িতে একাধিক ছাত্র সারাবছর থেকে খাওয়া-দাওয়া করে পড়াশুনা চালিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে এম এন লারমা ছিলেন ভদ্র, নম্র, ক্ষমাশীল, সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং মৃদুভাষী ব্যক্তি। তার স্মরণশক্তি ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মননের অধিকারী ছিলেন। মূলত তিনি এবং তার

১ সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।



ভাই-বোনেরা এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবারের গুরুজনদের কাছ থেকে বাস্তব জীবনের শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিকচেতনাসহ সংগঠন গড়ে তোলার শিক্ষাও অর্জন করেছিলেন। লারমার ছোট ভাই সন্তু লারমা শিক্ষাজীবনে মাতা-পিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন—

> পিতা শুধু একজন শিক্ষকই নন। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একজন রাজনীতিবিদ, আর অন্যদিকে তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। [...] তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

এম এন লারমা ছোটবেলা হতেই পড়াশুনা করতে বেশি পছন্দ করতেন। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রসঙ্গে তার বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা জানান—

> স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও মঞ্জু গল্পের বই পড়তো সবসময়, এই অভ্যাসটা প্রথম শ্রেণি থেকেই ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা এনে দিতেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক বসুমতি, শুকতারার নাম মনে পড়ে। এসবই মঞ্জু গভীর আগ্রহ সহকারে পড়তো। বৃত্তির টাকা দিয়ে বই কিনত। প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে সে নিজেই বই সংগ্রহ করত। এভাবে তার নিজের সংগ্রহেই অনেক বই পত্র ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাবিস্তারে এম এন লারমার অবদান

কর্ম ও পেশাগত জীবনে তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। তবে শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল অনেক বেশি, কেননা তিনি খুব সহজে কঠিন বিষয়কে সহজ সরলভাবে বোঝাতে পারতেন। এছাড়াও তিনি ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদেরকে দেশপ্রেমের চেতনাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এম এন লারমা সর্বদা ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য গঠনমূলক আলোচনা করতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তবে তিনি যে বিষয়ে আলোচনা করতেন, আবার সপ্তাহ খানেক পর সে বিষয়ে তাদের থেকে জানতে চাইতেন। লারমা নিজে অনেক বই পড়তে ভালোবাসতেন তাই তিনি তার ছাত্রদেরকেও বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে বলতেন। তিনি একাধারে নিজ দেশের সংগ্রাম, আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি চীন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংগ্রাম ও আন্দোলন সম্পর্কেও বলতেন যেন তারা অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়। সেসময় পাহাড়ি ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এভাবেই তিনি ছাত্রদের কাছে প্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন।

এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদেরকে সচেতনতার শিক্ষাও দিতেন। তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তাদের চেতনাকে যেন জাগ্রত করে তোলা যায়, তার শিক্ষাও তিনি দিতেন। এই প্রসঙ্গে বিজয় কেতন চাকমা বলেন—

> মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। [...] তিনি বলতেন রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত কোন অধিকারই টিকে থাকতে পারে না। তাই প্রথমেই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা মানুষের নিকট হতে অতি সহজেই সস্তা বাহবা পেতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা মানুষের তেমন উপকার হবে না।

পাহাড়ি ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা ও জুম্ম জাতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সূচনা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সারাটা জীবন ছিলেন বিপ্লবী ও প্রতিবাদী। জাতিতে আদিবাসী হলেও তার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন শাসনব্যবস্থা ছিল সমান্ততান্ত্রিক এবং সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ। কিন্তু তার পরিবার-পরিজনেরা সর্বদাই অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজাশ্রেণির ওপর যে শোষণ তার প্রতিবাদ করেছেন। তার জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর থাকাকালে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। তিনি মূলত আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশে শিক্ষার প্রসার করেছিলেন। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, তার পরিবারের প্রায় সকলেই এই সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন এবং যারা রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তারা জুম্মবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জুম্ম সমাজে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করেছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েছিলেন, কেননা তিনি স্কুল জীবনেই গভীরভাবে দেখেছেন যে, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মম অত্যাচার, জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এই জুম্ম আদিবাসীরা। সুদূর অতীত থেকেই এই আদিবাসীরা শোষিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শোষিত হয়েছে, '৪৭ পরবর্তীকালে পাকিস্তান শাসক কর্তৃক নির্মিত কাপ্তাই বাঁধের ফলে লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এম এন লারমা



ষাটের দশকে ছাত্রদের একত্রিত করে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে তাদের সংগঠিত করেন। তিনি ছাত্রদের পাশাপাশি যুবসমাজকেও একত্র করেন। ফলে বলা হয় যে, ষাট এবং সত্তর এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। তখন সর্বত্রই এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলন লক্ষ করা যায়।

কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

১৯৬০ সালে যখন পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে তখন এম এন লারমা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই বাঁধ নির্মাণের যে লক্ষ্য ও নীতি তা ছিল মূলত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। তাই তিনি তখন এর বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। যখন কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয় তখন এম এন লারমার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

> ১৯৬০ সালে এই মরণফাঁদ প্রকল্প চালু হয়। এ ঘটনাটি মারাত্মকভাবে নাড়া দেয় এম এন লারমার জীবনকে, এটি হয়ে উঠে তাঁর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। এ সময়ে শয়নে-স্বপনে জাগরণে তাঁকে তাড়া করে ফিরতে থাকে এক মহাবিপদের চিন্তা। জুম্ম জনগোষ্ঠীর শিকড় ছিন্ন এবং অস্তিত্ব বিপন্ন করা এবং জুম্ম সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিলুপ্ত করার এক 'রাষ্ট্রীয়' ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পাহাড়ি জনগণসহ দেশের আপামর জনগণকে সচেতন, সক্রিয় ও সংগঠিত করার কঠিন কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন।

কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে লারমা তৎকালীন স্বনামধন্য পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ'-এর চিঠিপত্র কলামে প্রবন্ধ লিখেন। এছাড়া কলকাতার 'The Statesman' পত্রিকাতেও তার এই বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। যেখানে বলা হয় যে, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার প্রকল্প। এম এন লারমা মনে করতেন—এই কাপ্তাই প্রকল্প হলো পাহাড়িদের অস্তিত্বকে বিলোপ সাধনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং তাদের জনগোষ্ঠীকে নিঃস্ব করার একটি প্রকল্প যাকে তিনি পাহাড়িদের 'চিরন্তন কান্না' বলে অভিহিত করেন। মূলত তখন এই কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে সামন্ত নেতারা প্রতিবাদ করেনি এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বরং তারা পাকিস্তানি সরকারের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসা করে। কিন্তু এসময় এম এন লারমা জনগণকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন—

একদিকে পাক শাসকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের পাহাড়ি জাতি বিনাশী এ সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে অভিন্ন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ নির্মাণের কাজে, জুম্ম যুব শক্তিকে জাতীয় অগ্রণী বাহিনী হিসেবে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্রসর করার কাজে, সকল শোষণ-নির্যাতন, অশিক্ষা কুসংস্কার থেকে মুক্তির সামাজিক আন্দোলন গড়তে 'গ্রামে চলো' স্লোগান নিয়ে গ্রামঞ্চলে 'জাতীয় শিক্ষায়' স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং যুব বাহিনীকে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এম এন লারমা।

এম এন লারমা ১৯৬২ সালে এই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে একটি লিফলেট প্রচার করে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জায়গায় পৌঁছে দেন। এই লিফলেটটি তখন জনগণের মধ্যে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে তৎকালীন সরকার ১৯৬৩ সালে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। ১৯৬৫ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কাপ্তাই বাঁধের কারণে এম এন লারমার যে শিক্ষা আন্দোলন সেটা সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল; পরবর্তীকালে যেটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

এম এন লারমার নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন ও কার্যক্রম

ছাত্রাবস্থায় এম এন লারমা ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ১৯৫৬ সালে এস এস সি পরীক্ষার সময় তিনি যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে পরীক্ষার্থীরা যেন তাদের সুবিধা অনুযায়ী আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য তিনি সহপাঠীদের নিয়ে অনশন ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। অবশেষে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নিয়েছিল। এছাড়াও ১৯৫৭ সালে তারই নেতৃত্বে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা 'পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন' এ অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা নির্মিত ১৯৬০ সালের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ছাত্র সমিতির আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। এছাড়া ১৯৬৩ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন এবং পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি প্রায় ষাট হাজার পাহাড়ি আদিবাসী দেশান্তরিত হয়। এভাবে ৬০-এর দশকে প্রায় পুরোটা সময়েই আদিবাসীদের ক্রান্তিকালীন অবস্থায় ছাত্ররা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এম এন লারমার নেতৃত্বে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি

এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ জনগণকেও সচেতন করেছিল। পাশাপাশি তারা তখন সামন্ত



নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও আন্দোলনরত ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাহাড়ি ছাড়াও সমতলের নেতাদের সাথে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি বাস্তবতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। অর্থাৎ তারা-ই তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে। তাই লক্ষ করা যায় যে, এম এন লারমার নেতৃত্বেই তখন এই আদিবাসীদের আন্দোলন প্রায় পুরো চট্টগ্রামেই বিস্তার লাভ করেছিল। সকল শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালের Indigenous and Tribal Population-এর ১০৭নং ধারাতে বলা হয়েছে :

(চ) অনুচ্ছেদ ২১-এ শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Measures shall be taken to ensure that members of the populations concerned have the opportunity to acquire education at all levels on an equal footing with the rest of the national community.

(ছ) অনুচ্ছেদ ২৩-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, Children belonging to the population concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong.

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১১টি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষা ও মাতৃভাষা সম্পর্কে কোনও শাসনব্যবস্থায়ই কোনও ধরনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ আদিবাসীদের কোনও অধিকার ছিলনা। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবারের নেতৃত্বে শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল। এম এন লারমা যখন জাতীয় সংসদ সদস্য হন তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন। তার স্বপ্ন ছিল—

দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত-শ্রেণিগত নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং ঔপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও নিপীড়নের চিরঅবসান হবে।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভাষার আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংসদে তৎকালীন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও ক্রীড়া (শিক্ষা বিভাগ) মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তার প্রস্তাব শেষ করেন। তিনি জানতে চান—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি পৃথক ভাষাভাষি চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাকদের ভাষা উন্নয়নের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং

খ. প্রশ্নে উল্লিখিত দশটি ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; করিয়া থাকিলে, কবে হইতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তায়িত হইবে; না হইলে, উহার কারণ কি?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪ : ২৯২)—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ প্রচলিত ১০টি ভাষা উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হেতু দেশের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নিবিড় হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জেলার মত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করা হইতেছে।

এম এন লারমা আরও কিছু বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না; হইলে উহার সংখ্যা কত এবং ঐগুলির নাম কি;

খ. উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কোনটার উন্নয়নের কাজ অর্ধসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কিনা; থাকিলে উক্ত বিদ্যালয়গুলির নাম কি; এবং

গ. খ-উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের কাজ সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; থাকিলে, কবে করা হইবে, না থাকিলে, উহার কারণ কি? (পার্বত্য চট্টগ্রাম ভাষার উন্নয়ন', খণ্ড-২, ১৯৭৪: ২৯২)।

এছাড়াও তিনি সংসদে দেশে কতটি সংস্কৃত ও পালি টোল এবং চতুষ্পাঠী কলেজ আছে তার নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতে চান এবং



সেসকল শিক্ষকগণ কোন সরকার কর্তৃক শিক্ষক কল্যাণ ভাতা পান কি না এবং সেটা কি পরিমাণ, তা তিনি জানার জন্য প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোনও প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না জানতে চান। কিন্তু এই বিষয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী উত্তরে বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন করা হবে কিন্তু এখনও অবধি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে তখন সংবিধানে আদিবাসীদের মাতৃভাষাকে কোনপ্রকার উন্নয়ন না করে বরঞ্চ পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়। আর এর বিরুদ্ধে তখন এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু সংবিধানে আদিবাসীদের এই ভাষাকে কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া লারমা ১৯৭২ সালে সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সংশোধনী দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রস্তাবে বলেন—

> ১৭ অনুচ্ছেদের ৩য় পঙক্তিতে অবস্থিত 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত' শব্দাবলীর পরিবর্তে 'শিক্ষার বিভিন্ন দিকে মেধা ও প্রবণতা অনুসারে' শব্দাবলী সন্নিবেশ করা হোক।

তিনি বলেন—

> আমি এই সংশোধনী এনেছি তার কারণ, এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। শিক্ষা যদি শুধু আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত হয়, তাহলে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশের কর্ণধার হবে, মেধা-অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। সেই মেধা ও প্রবণতা বিভিন্ন জনের বিভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়। সেই দিকে লক্ষ রেখে যদি মেধার প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার স্তর নির্ধারিত হয়, তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিভার বিকাশ লাভ হবে। আর যদি মেধা ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদেরকে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করে আরও বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যদি মেধা ও প্রবণতাকে শিক্ষার সব স্তরে যথার্থভাবে মর্যাদা দেওয়া না হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মেধার উপযুক্ত বিকাশ সাধিত হবে না। কিন্তু ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ঘাতকদের ষড়যন্ত্রে তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে তার ছোট ভাই ও সহকর্মী সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার বিস্তারের পাশাপাশি পাহাড়িরা নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করেছে।

উপসংহার

জাতিতে আদিবাসী হলেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা-চেতনা ছিল দেশের সকল অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি ছিলেন বিনয়ী, মিতব্যয়ী, সাহসী, সৎ ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তিনি যখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতিতে যোগদান করেন তখন থেকে তার নেতৃত্বেই এই সমিতির ছাত্ররা তাদের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন সাংসদ হন তখনও তিনি জাতীয় সংসদে আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং তাদের মাতৃভাষাসহ জাতিসত্তা সম্পর্কে বলেছেন। আর এভাবেই তার নেতৃত্বে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সচেতনতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতাও গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সজীব চাকমা বলেছেন—

> এম এন লারমার জন্ম, শিক্ষালাভ এবং আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে কোন গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাড়িয়ে দিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাগরিত করতে, দেশের ও বিশ্বের দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার শিক্ষা লাভ ছিল অতীতের অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম, তার কর্মজীবন, জীবন-দর্শন অন্য সবার চাইতে আলাদা। তিনি শিক্ষা লাভ করে কোন চাকুরী নিয়ে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নেননি। তিনি শিক্ষকতা করেও সেখানে আবদ্ধ থাকেননি, ওকালতি করেও উকিল হয়ে থাকেননি। কেননা তিনি ভাবতেন আরো অনেক কিছু, তিনি অনুভব করতেন আরো অনেক বিষয়। তিনি জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ ও নিপীড়িত জাতির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের কথা। তিনি বুঝতেন আধুনিক সব রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। তিনি ভাবতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও নিপীড়ত-নির্যাতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কথা, তাদের জাগরিত করবার ও সংগঠিত করবার কথা, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কথা। তিনি তাঁর এই চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হন।

এম এন লারমা ১৯৬০-র দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে অনেকের মনে নতুন নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঘটান যেন শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সকলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সহকর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ভূমিকা রাখেন যার কারণে তার সহকর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে



পাহাড়ি অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন, ফলে স্কুলগুলোতে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৭ সাল থেকে ৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করছে, যার ফলে আদিবাসী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিতে আদিবাসীদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি সংক্ষেপ করা হয়েছে– তথ্য ও প্রচার বিভাগ)।

> ‘আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামূহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।’
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*



এম এন লারমার প্রতিবেশ জাতীয়তাবাদ

।। ড. ঈশিতা দস্তিদার ।।

আজ ১৫ সেপ্টেম্বর, এম এন লারমার ৮৭তম জন্মদিন। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী অধিকার সংগ্রামী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে।

এম এন লারমা ছিলেন মূলত একজন পরিবেশ- জাতীয়তাবাদী। যে চিন্তায় তাঁর জনপদের স্বাতন্ত্র্যকে পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভূ-সম্পদকেন্দ্রিক চর্চা ও তার গঠন-পুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবা হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিবেশ কীভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারে।

পরিবেশ জাতীয়তাবাদের মূল ধারণা হলো স্বদেশ সংযোগ ও সম্পদের সার্বভৌমত্ব। এ ধরনের জাতীয়তাবাদীরা দেশের মাটি, বন, নদী ও পর্বতকে মাতৃভূমির ভৌত সত্তা হিসেবে গণ্য করেন। এই সত্তা তথা পরিবেশের যত্ন নেওয়া ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করাই তখন প্রকৃত দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে ওঠে। দেশপ্রেম সেখানে আমলাতন্ত্রের মাঝে ঠাঁই নেয় না। পরিবেশ জাতীয়তাবাদীরা বরাবরই আত্মনির্ভরশীলতার পক্ষে জোর দেন। তাদের মতে, জাতিগুলোর দরকার বিদেশি আমদানি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর না করে তার নিজস্ব পানি, শক্তি, খনিজ সম্পদ এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার লোকজ পথ খোঁজা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এম এন লারমার এ রকম ভাবনার উৎস কী? পটভূমি কী? আমরা জানি, একটি পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে এম এন লারমার অভিষেক। ষাট দশকের গোড়ার দিকে, পাকিস্তান সরকার নির্মিত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ আবাদি জমি ডুবিয়ে দেয় এবং এক লাখের বেশি জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করে। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, বাঁধটি স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করেছিল এবং স্থানীয় প্রাণসম্পদের গঠন ও পুনর্গঠনই ব্যাহত করেছিল। একজন ছাত্রনেতা হিসেবে লারমা এ রকম কৃত্রিম প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধরনের প্রতিবাদ সংগঠিত করেন এবং বাস্তুচ্যুত জুমিয়া (পাহাড়ি কৃষক) জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। একই সঙ্গে তিনি এই দাবির সীমাবদ্ধতাও দেখেন।

এই অভিজ্ঞতা তাঁর উপনিবেশবাদবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রণীত প্রথম সংবিধানে দেশের জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করে একটি একক বাঙালি জাতীয় পরিচয় চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি বারবার বলেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন। কতটা পেরেছেন বা পারেননি, সেটা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়। কিন্তু তাঁর ভাবনার প্রতিবেশগত মর্মটুকু অন্য সব জাতিসত্তার বোঝা জরুরি। রাজনৈতিক পরিবেশবিদরা যাকে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' বলেন, অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চলের জনতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বাস্তবতা পরিবর্তন করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা, তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন লারমা।

১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে তার ঐতিহাসিক প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করে। গোষ্ঠীগত ভূমি মালিকানা (মৌজা ব্যবস্থা) সংক্রান্ত স্থানীয় নিয়মকানুন সুরক্ষিত রাখার জন্য লারমা তখন স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। লারমা যুক্তি দিয়েছিলেন, ব্যাপক বসতি স্থাপনের ফলে বন উজাড় হবে এবং পাহাড়ের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হবে। অর্থাৎ সমস্যা শুধু মানুষে-মানুষে হবে না। প্রাণ-প্রকৃতিগতও হবে।

বহু বছর পর এখন কী দেখছি আমরা? পরিবেশ ভাবনাহীন রাজনীতির কুফল নিশ্চয়ই আমরা টের পাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও সমতলের আদিবাসীরা, বিশেষত উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীরাও পূর্বপুরুষের ভূ-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভোগ, ব্যবহার, অধিকারে সমস্যার সম্মুখীন। বিভিন্ন ধরনের পূর্বাপর ভাবনাহীন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্প, পর্যটনকেন্দ্র ভূ-সম্পদের ধ্বংস সাধন করে চলেছে। এতে আদিবাসীদের ভূমি হাতছাড়া হওয়ার খবর পাওয়া যায় নিয়মিত। বংশপরম্পরায় নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমিতে আনুষ্ঠানিক অধিকার না থাকায় তারা সবসময় রাষ্ট্র বা প্রভাবশালী বেসরকারি সংস্থার কাছে ভূ-সম্পদ হারানোর ঝুঁকিতে থাকে। অথচ আইএলও কনভেনশন নম্বর ১০৭ এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন মানুষের ঐতিহ্যবাহী ভূমি অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এখানে তার বাস্তবায়ন কই?

এম এন লারমা হয়তো এ রকম কিছু কল্পনা করেই জুম্ম জাতীয়তার রূপকল্প হাজির করেছিলেন। তিনি যে ধারণার পথপ্রদর্শক ছিলেন, সেটা ২০২৬ সালেও সমান প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের এই পরিবেশগত জাতীয়তার জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া জরুরি এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল বহুল চর্চিত 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা করা সম্ভব।



স্মৃতি চারণ

।। শরৎ জ্যোতি চাকমা ।।



তখন সন্ধ্যা পার হয় হয়। ফেরারি জীবনের নানা চিন্তায় ব্যস্ততম সময়ে হঠাৎ মোবাইল রিং। মোবাইল থেকে সামান্য দূরে থাকায় প্রথম রিং মিস হয়। কোন বিলম্ব না করে মোবাইল আবার বেজে উঠে। কাজ রেখে মোবাইলের কাছে গিয়ে দেখি এ্যাড. জুয়েল দেওয়ান। জুয়েল দার পরামর্শে চট্টগ্রামে পাহাড়ি হোস্টেল উদ্ধার সংক্রান্ত একটি মামলায় আইনজীবী নিয়োগ করি। ভেবেছিলাম সেই বিষয়ে জুয়েল দা কথা বলবেন। রিসিভ করে আমাকে প্রশ্ন করেন, জন দা কেমন আছে? বলি উনার সাথে কথা হয় নাই। অসুখ শুনেছি। উনি বলেন, জন দা তো ভালো নেই। এমন সময়ে জন দার মমতাময়ী মা-বাবার কান্নাকাটির শব্দ শুনি জুয়েল দার ফোনে। তখন আর বুঝতে বাকি নেই। ফোন অনেক্ষণ আমার কানে। কথা নেই। লাইন কেটে যায়। জুয়েল দা ফোন করার একদিন আগে পিসিপি'র সাবেক দুই নেতার সাথে আমার ফোনে কথা হয়। তারা বলছিল জন দা ভালো আছে। চিকিৎসা চলছে। জন দার সাথে ফোনে কথা হয় এমন কয়েকজনও কোন কোন সময় আমাকে বলছিল জন দা অসুস্থ। কি অসুখ আমি ভালো জানতাম না। রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছেন। জন দার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তার অকাল প্রয়াণে জুম্ম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা হারিয়েছি একজন সাহসি ত্যাগী বিপ্লবী বন্ধুকে। কমরেড জন চাকমার স্মৃতি অমর হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কাপ্তাই থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সহ-সভাপতি জন চাকমা। আমরা সকলে জন দা বলে ডাকি। যতদূর জানি জন দা, মা-বাবার বড় সন্তান। চন্দ্রঘোনার মিশন এলাকায় তাদের বেড়ে উঠা। তার দুই বোন নাম করা চিকিৎসক। এক ভাই প্রকৌশলী। সমাজে সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। রাঙ্গামাটির নাম করা আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান জন দার ছোট বোন এর জামাই। রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরে নিজস্ব বাসায় থাকে। জন দার মা বেঁচে থাকলেও বাবা দুনিয়া থেকে অনেক আগে চলে গেছেন। তার পরিবারের সাথে আমার পারিবারিক কোন যোগাযোগ বা চেনা জানা ছিল না। দলে কাজ করার সুবাদে জন দার সাথে পরিচয় এবং আন্তরিকতা। জুয়েল দা রাঙ্গামাটির নাম করা উকিল এবং সংগ্রামী। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষের সাথে তার যোগাযোগ প্রশংসনীয়। আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ-এর রাজনীতি করি. জন দা তখন ডা. নীলু কুমার তনচংগ্যার প্রতিষ্ঠিত হিল ফ্লাওয়ার এনজিওতে কাজ করতো। কোন পদবিতে কাজ করে জানি না।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলাম। রিজার্ভ বাজার থেকে বিরতিহীন লঞ্চ সার্ভিস। অনেক লোক উঠেছে সেই দিন বরকল--হরিণা লঞ্চে। সকাল ৭ টায় রাঙ্গামাটি ছেড়ে যায়। শীতের দিন। গায়ে গরম কাপড়। রিজার্ভ বাজারের সামনে বিরাট পানির বিল, যেন উপসাগর। বর্ষার মত না হলেও বাতাস বহমান থাকে। ছোট ছোট ঢেউ লঞ্চে মৃদু নাচন তুলে। বরকল হরিনা লঞ্চ চলমান। সাদা কুয়াশা সব পানি ঢেকে রাখলেও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পেদাটিংটিং এর দিকে সুর্যের আলোক রশ্মির মত লাল রঙের কি যেন দেখা যায়। বুদুর বুদুর বিটঘুটে শব্দে চলা লঞ্চের ছাদে একটু জোরে কথা না বললে পাশের জনের কথাও বুঝা যায় না। লঞ্চের বেলকনিতে চাকুরে বাবুরা বসেন। চাকরিজীবী বাবুদের জন্য সিট রির্জাভ রাখা হয়। আমার মত সাধারণ মানুষ বসলে লঞ্চের চারাং না হলে স্টাফ এসে উঠিয়ে দেয়। আমাকে কয়েকবার সিট ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তখন থেকে কম বসা হয়।

জন দা'রা সেদিন বেলকনির সেই কেবিনে বসেছিল। আবহাওয়া ঠান্ডা হওয়ায় সব যাত্রীর টার্গেট ছাদের কেবিনে



বসা। লঞ্চ রিজার্ভ বাজার পানির বিল পার হওয়া শেষ হতে হতে রেবতি দা বেলকনির কেবিন থেকে বেরিয়ে আছে। কেবিনের বাইরে গাছের রেলিং-এ আমি বসে আছি। পরিচিত কয়েকজনে সাথে কথা বলছিলাম। রেবতি দাকে নমস্কার দিয়ে হাত মিলাই। রেবতি দার সাথে জন দা। তার সাথেও হাত মিলাই। হাই হ্যালো করি। অফিসের কাজে রেবতিদা আর জন দা হরিণা যাবে। এক সাথে চা সিগারেট খেয়েছি কিনা মনে নেই। খাওয়া হয়েও থাকতে পারে। শীতের দিন। তাছাড়া তখন আমি ছিলাম চেইন স্মোকার। রেবতি দা এলাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ভাই হলেও দূরত্বহীন মেলামিশা সিগারেট ভাগজোক করে খাওয়াকে একটি বন্ধন ব্যতীত অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই। সে দিন জন দার সাথে কাছাকাছি বসে কথা হয়। রেবতি দা জন দাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি বলি, জন দাকে আমি চিনি। কথা বলা কম হয়েছে। জন দাও বলেন, আমিও শরৎ ভাইকে চিনি। জন দা সেদিন মাথায় ক্যাপ, নীল রঙের একটা মোটা কাপড়ের জাম্পার, কালো পেন্ট আর কেডস পড়ে হাসিভরা মুখে কুয়াশাভরা প্রকৃতির দিকে দূর দিগন্তে তাকিয়ে থাকে।

জুম্ম আদিবাসীদের জীবনের অভিশাপ কাপ্তাই বাঁধে জমা কর্ণফুলি জলের উপর বুদুর বুদুর শব্দে চলা লঞ্চের উপর থেকে জন দার মত অনেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করছে। কিন্তু জন দার উপলব্ধি আর অন্যদের উপলব্ধি নিশ্চয় এক নয়। জন দা প্রকৃতি আর জলের মধ্যে যে একটা প্যারাডক্সিকেল বিষয় আছে তা নিয়ে উদাস মনে লঞ্চে উঠে হরিনা যাচ্ছেন। জন দার মনে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রামের কথা আছে। এই জল জুম্মদের সর্বোচ্চ কেড়ে নিয়েছে। এই জল মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে স্বাভাবিক জীবনে থাকতে দেয়নি। আর অন্যরা প্রকৃতি আর জল সবই উপভোগ্য মনে করে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যাচ্ছেন। বরকল পেরিয়ে ভূষণছড়ায় পোড়াবাড়ি ঘাটে আমি নেমে যায়। রেবতি দা আর জন দাকে বিদায় জানাই। আমার জন্মভিটায় আসার নেমনতন্ন করি। বেড়াতে আসার কথা দিয়েছিল জন দা। কিন্তু আসা হয়নি। তাকে আর কোন দিন আমার জন্মভিটায় বেড়াতে আসা হবে না।

একদা ১০ নভেম্বর জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু দিবস পালনের জন্য পলাশ খীসা দাদার সাথে রাঙ্গামাটি থেকে বড়ইছড়ি যায়। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। বড়ইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই উপজেলা কমিটির উদ্যোগে স্মরণ সভা হবে। সেখানেও জন দার সাথে আবারও দেখা হয় এবং কথা হয়। এর আগেও বরকল-হরিণা লঞ্চে দেখা হয়েছে। আমাকে শরৎ ভাই বলে সম্বোধন করেন। সময়ের সাথে সাথে মংনুচিং দা, জন দা এবং চাই মং দাসহ কাপ্তাই উপজেলার যুব সমিতি পিসিপি সকলের সাথে খুবই আন্তরিকতা গড়ে উঠে। মংনুচিং দা, জন দা এবং চাই মং দা উদার মনের মানুষ। তাদের তিন জনের মধ্যে গভীর ভাব। তিনজনেই পার্টির কাপ্তাই থানার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক। এই তিনজনের নেতৃত্বে চলতো কাপ্তাই উপজেলার পার্টির কার্যক্রম। বর্তমানে মংনু চিং দাকে একা করে জন দা এবং চাই মং দা দু'জনই পরপারে চলে গেছেন। আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন কালে জন দাদের সাথে সাংঠনিক কারণে সম্পর্ক আরও কাছের হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য বাবু মংনু চিং মারমা রসিক মানুষ। আমাদেরকে ভালোবাসেন। আমাদের সাথে চলাফেরা করেন। নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। বাড়িতে দাওয়াত দেন। আমরা যাই। বৌ দি হাসি খুশি। অনেক পরিশ্রমী মানুষ। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে এক সাথে যাওয়া হয়। উপজেলা ভিত্তিক সাংগঠনিক কোন কর্মসূচি নিলে আমাকে আর উদয়ন ত্রিপুরাকে কাপ্তাই পোস্টিং দিতে পার্টি নেতৃত্বের কাছে তদবির করতো। তাদের এই তদবির অন্যায় কোন কিছু না। তাদের সাথে আমাদের মন এবং ভাবের অনেক মিল বিধায় তারা আমাদের চান। তাদের কাছে যাওয়ার এবং কাছে থাকার চেষ্টা করতাম। অনুষ্ঠান শেষ করে জন দাসহ এক সাথে রাঙ্গামাটি চলে আসি। জন দা রাঙ্গামাটিতে পরিবার নিয়ে নিজস্ব বাসায় থাকতেন।

জন দাসহ আমাদের একটি সমিতি গঠন করি। নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১৩ জন সমমনা সহযোদ্ধা নিয়ে এই সমিতি গঠন করেছিলাম ২০১১ সালে। নাম দিয়েছি রিবসি। রিবসি অর্থ হলো– রি দিয়ে মারমা ভাষায় রিগৃখ্যং বা শঙ্খ নদী। বি দিয়ে চাকমা ভাষায় বরগাং বা কর্ণফুলি এবং সি দিয়ে ত্রিপুরা ভাষায় সিয়াই বা চেঙ্গি নদী। ২০১৮ সালে আওয়ামীলীগ জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের উপর আগ্রাসী হলে জন দা সহ অনেক রিবসি সদস্য বাধ্য হয়ে সমিতি থেকে মেম্বারশীপ বাতিল করে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে বিরসি'র সাধারণ সভা হতো। এক সাথে খানাপিনা করতাম। নানা বিষয়ে কথা বার্তা হতো। জন দা আমাদের সকলের কাছে অতীব প্রিয়জন। অনেকটা তাকে ঘিরেই আমাদের সব কিছু হতো। ব্যক্তিগতভাবে জন দা আর আমার মধ্যে রাগারাগী কিংবা ঝগড়াঝাটি কোনটিই হয়নি। তারপরেও অজান্তে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি ক্ষমা করবেন জন দা।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর পরই পার্টি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটিতে সংযুক্তি দেয় আমাকে। জেলা সদস্য হওয়াতে জন দাদের সাথে সাংগঠনিকভাবে আরও রিলেটেড



হয়ে পড়ি। আগে ছাত্র সংগঠন এখন অভিভাবক সংগঠন। পার্টি কাপ্তাই শাখার যে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার চেষ্টা করি। পার্টি অনুষ্ঠান, সাংগ্রাইং, বড় দিনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা দল বেঁধে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক চাই মং মারমা নারায়ণগিরির সুসন্তান। সুঠাম দেহের অধিকারী। সেখানে স্থানীয়। একজন কার্বারি। আমরা মাঝে মধ্যে কার্বারি দাদা বলে ডেকে থাকি। পার্টির একনিষ্ট এবং ত্যাগী নেতা ও কর্মী। পার্টির সকল কর্মসূচিতে সক্রিয় একজন উদার মনের মানুষ। তার নারায়ণগিরির বাসায় গিয়ে খানাপিনা খেয়েছি। আয়োজনে কোন কমতি নেই। মংনু চিং দা মজা করে বলতেন, চাই মং কার্বারি এক সাথে ৫ কেজি গরু মাংস খেয়ে ফেলেন। চাই মং দা একজন ফুটবল খেলোয়াড় এবং পরে পার্টির সমর্থনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। অনেক জনপ্রিয় একজন মানুষ। ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে করে আওয়ামীলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিলে জনসংহতি সমিতির সর্বস্তরের সদস্য-নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দিয়ে ধরপাকড় শুরু করে। চাই মং দা দীর্ঘ সময় কারাবরণ করেন। কারাগারেই মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। কারাগার থেকে যখন মুক্তি পান, শরীরে রোগের অনেক অগ্রগতি। অবশেষে অদম্য এই মরণ ব্যাধি ক্যান্সারের কাছে পরাজয় বরণ করেন প্রিয় নেতা চাই মং মারমা। একইভাবে ২০১৮ সালে ২৭ জুন শুভলং বাজারে কথিত হত্যা মামলায় জন দাকে জড়িত করালে জন দা এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি স্বেচ্ছায় আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে যথাসময়ে চিকিৎসা না পাওয়ায় তাকেও দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়। পার্টির আরও অনেক নেতাকর্মীর জীবনেও এমন পরিণতি হয়েছে।

২০১৮ সালে আওয়ামীলীগ রাতের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশী আগ্রাসী হয়। তার প্রধান কারণ আওয়ামীলীগের প্রার্থী দীপংকর তালুকদারকে এই নির্বাচনে জিতাতে রাষ্ট্রীয় টুলস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। এই নির্বাচনে জনসংহতি সমিতি সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী ঊষাতন তালুকদার ১,২০,০০০ ভোট পেয়েও তাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র আওয়ামীলীগের প্রার্থীর পক্ষে অস্বাভাবিক ভোট কাষ্টিং দেখিয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের সাধারণ জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে কোন নির্বাচনে পার্টি মনোনীত প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত হয়। এই জয় পাহাড়ের আওয়ামীলীগ ও রাষ্ট্রযন্ত্র সহ্য করতে পারে না। আওয়ামীলীগ এবং রাষ্ট্রযন্ত্র সব কিছুই নিজেদের মত করে করতে চায়। অন্যের মত এবং বিকাশ দেখতে পারে না। অন্ধ আনুগত্য এবং দাসত্বকে তারা ভালোবাসে। জনসংহতি সমিতির সংগ্রাম অন্ধ আনুগত্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে। তাই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনাকারী বাঙালি মুসলমান নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারা আর জনসংহতি সমিতির চিন্তাধারায় বিস্তার ফারাক। জনতুষ্ঠিবাদী নেতৃত্বের কারণে বাঙালি নেতৃত্বাধীন দলগুলোর নেতা কর্মীরা ক্ষমতা চায়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী যে কাউকে দূরে সরে রাখার লক্ষে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে। এমন রাজনৈতিক চিন্তাধারায় দুনিয়ায় কোন দেশ উন্নতির পথে এগুতে পারেনি। বাংলাদেশও পারবে না।

২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পরপরই স্থানীয় নির্বাচনেও আওয়ামীলীগ সমতলে যে কায়দায় ভোট করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে সেভাবে করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিজস্ব প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে আওয়ামীলীগের ভোট কারচুপি থমকে যায়। স্থানীয় নির্বাচনে জেএসএস এর প্রায় সব প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। অল্প কিছুতে আওয়ামীলীগ জয় পায়। সেখানেও রাষ্ট্রযন্ত্রের হস্তক্ষেপ ছিল। যেমন: বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়ন। সেই সময়ে হরিণা জোনের সিও লে. কর্নেল সাহাবুদ্দিন ফেরদৌস আদিবাসীদের ভোট ডাকাতি করে সেটেলার প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনকে জিতিয়ে দিয়েছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত ভূষণছড়ায় একজন সেটেলার মুসলিম বাঙালিকে গায়ের জোরে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে তৎকালীন আওয়ামী প্রশাসন। আওয়ামীলীগ সরকার সেই সময়ে জেএসএস-এর কিছু বিপদগামী সদস্যকে অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে নানাভাবে বিভাজিত করে। জেএসএস সদস্য ও শুভকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে রুজু করে শতশত গায়েবি মামলা। এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় অনেককে আটক করে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখেছে। ক্রসফায়ার করে পার্টির সদস্য জ্ঞান শংকর চাকমাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার জেএসএস নেতাকর্মী নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে জন চাকমাও একজন।

‘আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।’

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা



পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের অপহরণের শিকার আমরা পাঁচজন

।। কিশোর কুমার চাকমা ।।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে সেনা-মদদপুষ্ট প্রসিত বিকাশ খীসা, রবি শংকর চাকমা ও সঞ্চয় চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এই অভিযোগে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অনেক দাবি জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। তারা আরো বলে যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে সর্বাগ্রে প্রতিরোধ করতে হবে।" এভাবে তারা প্রথমে পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। তার অব্যবহিত পর তারা পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ করতে থাকে। এরপর তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর হামলা, হত্যা, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় করতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই চুক্তি বিরোধীরা দীপ্তিশংকর চাকমার নেতৃত্বে পানছড়িতে সুনেন্দু বিকাশ চাকমা রেনন এবং প্রাণময় চাকমা সুজন নামে জনসংহতি সমিতির দু'জন সদস্যকে সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে বাঘাইছড়ি হাই স্কুল মাঠে, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ দীঘিনালা হাই স্কুল মাঠে এবং ৪ মে ১৯৯৮ ধুধুকছড়ায় অস্ত্রজমাদান অনুষ্ঠানে আসার পথে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও হামলা করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জন্য শ্মশান ও চিতা তৈরি করে রাখা হয় এবং জনসংহতি সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

এছাড়া ১৩ জুন ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় সদস্য সত্যবীর দেওয়ানের নেতৃত্বে ৫ জন সিনিয়র সদস্য সাংগঠনিক কাজে নান্যাচরের ঘিলাছড়িতে গেলে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে ইউপিডিএফ অপহরণ করে। ১০ নভেম্বর ১৯৯৮ খাগড়াছড়িতে এন এম লারমার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের পর মহালছড়ি থেকে ফেরার পথে জনসংহতি সমিতির বহনকারী বাসের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়। জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২৪ মে ১৯৯৯ খাগড়াছড়ির বিজিতলা ও ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ নান্যাচরের কেঙেলছড়ি নামক স্থানে আক্রমণসহ তিনবার সশস্ত্র আক্রমন করা হয়। তবে ভাগ্যক্রমে শ্রী সন্তু লারমা বেঁচে যান। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরের গুনিয়া পাড়া (১৮ মাইল এলাকা) থেকে ডেনমার্কের প্রকৌশলী টরবেন মাইকেলসেন ও নেলস পারগ্রান্ড এবং ব্রিটেনের টিম সেলবি নামে তিন বিদেশী অপহরণ এবং কোটি কোটি টাকার মুক্তিপণ বিনিময়ে ২৯ দিন পর ১৭ মার্চ মুক্তি প্রদান করা হয়।

২০০৫ সালে ইউপিডিএফের ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সময় সরকার/শাসকশ্রেণির আদলে ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে এবং ২০০৬ সালের এপ্রিলের মধ্যে তাদের কাছে আত্মসমর্পণের সময়সীমা বেঁধে দেয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান থেকে লংগদুতে ফেরার পথে ৭ জন নারী ও শিশুসহ জনসংহতি সমিতির ৭০ জন সদস্য ও সমর্থককে অপহরণ করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে কয়েক মাস পরে একজন একজন করে মুক্তি প্রদান করা হয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে অদ্যাবধি জনসংহতি সমিতির শতাধিক প্রত্যাগত সদস্যসহ তিন শতাধিক চুক্তি সমর্থককে হত্যা করা হয়।

এসব হত্যা, অপহরণ ও সশস্ত্র হামলার মধ্যে ইউপিডিএফ কর্তৃক সর্বপ্রথম অপহরণের ঘটনা ঘটে ১৩ই জুন ১৯৯৮ তারিখে। সেদিন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়িতে পার্বত্য চুক্তির আওতায় অস্ত্রজমাদানকারী পাঁচজন জেএসএস সদস্য যথা— ১. শ্রী সত্যবীর দেওয়ান যদুনাথ বাবু, ২. শ্রী আশাপূর্ণ চাকমা নৈতিক বাবু, ৩. শ্রী কিশোর কুমার চাকমা ছেত্রী বাবু, ৪. শ্রী তরুণ কান্তি চাকমা মিকো বাবু ও ৫. শ্রী সোনারঞ্জন চাকমা সুমিত্র বাবু সাংগঠনিক কাজে গেলে ইউপিডিএফ কর্তৃক অস্ত্রের মুখে অপহরণের শিকার হয়।

১৩ই জুন ১৯৯৮ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটা বাজে আমরা উল্লিখিত পাঁচজন কর্মী সাংগঠনিক মিটিং-এর জন্য খাগড়াছড়িগামী একটা বাস গাড়িতে চড়ে রাঙ্গামাটির টিএন্ডটি থেকে রওনা হয়েছিলাম। আমরা পাঁচজনই ১৯৯৭ সনের ২রা



ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় প্রত্যাগত সদস্য। সেদিনের গন্তব্য ঘিলাছড়ি বাজারে পৌঁছে আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। বাজারে কয়েকটা দোকান ছাড়া বাকি সব বন্ধ দেখা গেল। যেই কয়েকটা দোকান খোলা ছিল সেগুলোতেও ক্রেতা-বিক্রেতার তেমন চাপ নেই। সবটাই ফাঁকা ফাঁকা বলা যায়। কয়েক মিনিট পর যে কয়েকটা দোকান খোলা ছিল সেখানে আমরা বিক্রেতাদের সাথে আনুষঙ্গিক আলাপচারিতার পর পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে শ্রী কেতুবর্মা (আলি চেয়ারম্যান)-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে যাই। সেখানে পৌঁছে গৃহকর্তা আমাদেরকে স্বাভাবিক আন্তরিকতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বসার জন্য মাদুর পেতে দেন। আমরা সবাই মেঝের উপর বসে পড়লাম।

কিন্তু আমার মনের গভীরে একটা উদ্বেগ কাজ করছিল এই ভেবে যে, আমরা মিটিং করতে এসেছি কিন্তু জন সমাগম অস্বাভাবিকভাবে নেই বললেই চলে। কৌতূহলের বসে চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাইলে উনি বলেন, এখন বাগান-বাগিচাতে কাজের মৌসুম। তাই একটু দেরিতে লোকজন আসতে পারে বলে জানান। আমরা সবাই উনার কথা শুনে বিরাজমান পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। যাক, কিছু সময় পর আমাদের জন্য খাবারের আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। তখন বেলা প্রায় এগারোটার কাছাকাছি। মোটামুটি প্রায় এক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ। তবে এরই ফাঁকে ফাঁকে আমাদের মাঝে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে থাকি।

এক সময় আমরা সবাই যার যার মতো করে বিশ্রাম নিতে শুরু করলাম। খাটের উপর আমি একা, মেঝেতে বাকি সবাই। হঠাৎ একদল যুবক বাড়ির উঠান পেরিয়ে একদম সিংহদরজায় হাজির হয়। তাদের একজনের কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় কাপড়ের থলে ছিল। বাকিদের কয়েক জনের হাতে ধারালো কিরীচের মতো দেখা গেছে। মনে হলো যতদূর সম্ভব অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আকারে মাঝারি হওয়াতে তাদের নড়াচড়াতে চোখে পড়ে যায়। বাইরে প্রখর রোদ। আচমকা তাদের দলনেতা গোছের একজন দরজায় এসে যদুদাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা মিটিং করতে এসেছ নাকি? যদুদা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আজকে আমাদের মিটিং করার কথা আছে। সেই কথা তো আমরা এখানকার মুরব্বীদের দিন কয়েক আগেই জানিয়ে দিয়েছি। এতে ওরাও সম্মতি দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে লোকটা বললো, না, তোমরা মিটিং করতে পারবে না। বরং যেই পথ দিয়ে এসেছ সেই পথ ধরে চলে যাও।

ততক্ষণে বাড়ির পিছন দিকে বেশ কয়েকজন যুবক আমাদেরকে ধমক দিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে বললো। আমরা নিরুপায় হয়ে সবাই বাড়ির উঠোনে নামতে বাধ্য হই। তখন তারা আমাদের সামনে পিছনে আর মাঝখানে ঢুকে সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কালো পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। দশ মিনিটের মতো দ্রুত হাঁটার পর পিছনে গ্রামের দিকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পেয়ে তারা আমাদের হুমকি দিয়ে বলে যে, হয়তো আর্মি আসতেছে। যদি আর্মি তাদের ধাওয়া করে তবে নাকি তারা (অপহরণকারীরা) আমাদেরকে সেখানে গুলি করে মেরে ফেলে পালিয়ে যাবে বলে দ্রুত হাঁটার জন্য আমাদের অব্যাহতভাবে শাসাতে থাকে।

আমরা তাদের উগ্র ব্যবহারে ভীত হয়ে সাধ্যমতো দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করতে বাধ্য হই। প্রায় আধ ঘন্টার মতো উঁচু পাহাড়ের ঢালের রাস্তা দিয়ে হাঁটার এক পর্যায়ে হঠাৎ একটা নতুন আবাদ করা জুমে এসে হাজির হই। জুমের ধান তখনো চারা অবস্থায়। তাদের নির্দেশ মতো সেই জুমের মাঝখান দিয়ে প্রায় পাঁচ শ গজ জুমের ঢাল বেয়ে নামার পর একটা ঝর্ণায় পাথরের উপর যার যার মতো বসে পড়লাম। মাথার উপর ঘন বাঁশ আর গাছের ঝোপ। বেশ ঠান্ডা। বাঁশের চোঙায় ভরে সেখানে ঝর্ণার জল পান করলাম আর বিশ মিনিটের মতো পাথরের উপর বসে সবাই বিশ্রাম নিলাম।

আর এভাবে প্রায় আধ ঘন্টার মতো বিশ্রামের পর এবার বাঁশ ঝাড়ের গভীর বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পালা। তারা সবাই আমাদের সামনে আর পিছনে আর মাঝে দু' একজন করে চলতে লাগলাম। পৌনে এক ঘন্টার মতো বুনো পথে হাঁটার পর সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এমন সুউচ্চ পাহাড়ে উঠা, তার উপর মানসিক চাপ। অবশেষে একটা তুলনামূলক সমতল ভূমি মাথার উপর প্রকান্ড গুটগুট্যা গাছের ঝোঁপ পেয়ে সবাই বসে পড়লাম। তখন ঠাণ্ডা দখিনার হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছিল। এক সময় অপহরণকারীদের একজন আমার পিছন দিক থেকে এসে আমাকে বললো, দাদা আপনি নাকি একটু ঐদিকে আসতেন। আমি পিছন ফিরে দেখলাম অপহরণকারীদের প্রায় পাঁচ ছয় জনের একটা দল জঙ্গলের গভীরে অবস্থান করে কী যেন বলাবলি করছিল। আমি সেদিকে যেন যেতে থাকি সেকথাই তারা নির্দেশ করছিল।

আমি ভারাক্রান্ত মনে সেদিকে অগ্রসর হতেই তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা পাইপগান আর অপর দু'জনের হাতে দু'টা কিরীচ দেখতে পেলাম। আমি তাদের সামনে হাজির হলে একজন আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম জানিয়ে বলতে থাকে যে, দাদা ক্ষমা করবেন, আপনাকে বাঁধতে হচ্ছে বলে আমাকে হাত পিছে করে অর্থাৎ পিছমোড়া করে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। এবার অপর দু'জনকে বলা হলো যে, আমাকে যেন আবারো জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার পিছনে সামনে তারা দু'জনই আমাকে নিয়ে গেলো প্রায় একশ গজের মতো দূরত্বের



জঙ্গলে গেলে আমাকে একটা গাছের গুড়ির উপর বসতে বলে, তখন খুবই দুচিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম হয়তো আমাদের এখানেই এক এক করে মেরে ফেলবে।

কয়েক মিনিট পর দেখলাম আমার সতীর্থ সবাইকে একইভাবে পিছমোরা করে বেঁধে নিয়ে আসছে। আমি একটু আশ্বস্থ হলাম। যখন সবাই জড়ো হয়ে গেলাম তখন অপহরণকারীদের একজন বলে উঠলো, আমরা সবাই যেন আমাদের পায়ের জুতোগুলো তাদেরকে বহন করতে দিই। সবাই নিজের জুতোগুলো তাদের বহন করতে দিলাম। অথচ অনেক আগেই আমাদের জুতোগুলো খুলে আমাদের নিজেদের বহন করতে হয়েছিল। বিশ মিনিটের মতো সেই ঝোঁপ-ঝাড়ে ঘেরা বুনো পথে হাঁটার পর হঠাৎ একটা নতুন আবাদ করা জুমে পৌঁছুনো গেল। জুমের মালিককে দেখে চেনা চেনা মনে হলো। অগত্যা দূর থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ভাই খাবার জল থাকলে একটু দিয়ে দিন, আমাদের খুবই তেষ্টা পেয়েছে বললাম। অমনি লোকটা তাড়াহুড়ো করে আমার সামনে এসে প্লাস্টিকের জলের বোতলটা বাড়িয়ে দেয়ার সময় বলে উঠলেন, দাদা ভালো আছেন তো? আমি বললাম, এই আর কি আমাদের ভালো থাকার অবস্থা। আমাদেরকে এমনভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে যে উপরে উপরে দেখলে বুঝা যায় না যে আমরা যে বাঁধা অবস্থায় রয়েছি। হঠাৎ তিনি আর কিছু না বলে জলের বোতলটা ফেলে মলিন মুখে তার কাজে ফিরে গেলেন। আসলে সেই লোকটাকে এক সময় আমি নিজেই তাদের স্থানীয় জোন এরিয়া দায়িত্বে থাকাকালীন পার্টিতে ভর্তি করেছি। কয়েক বছর পর বিভিন্ন কারণে ঝরে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘর-সংসারের কাজে নিজেকে ন্যস্ত করেছেন। তখনকার সময়ে বেচারা জুমচাষ আর কিছু ফল বাগান করে কোনো রকম পরিবার ভরণ-পোষণ করছেন।

এবার সামনের গভীর বাঁশঝাড়ে মোড়ানো সেই পাহাড়ের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিল অপহরণকারীরা। উঁচু ঢালু পাহাড়ের অচেনা পথে পা বাড়ানো ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে আদৌ মন চাইছিল না। ভারি পায়ে সাধ্যমতো চলতে বাধ্য হলাম। ঘণ্টা খানেক চলার পর এবার পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হচ্ছে। জঙ্গলাকীর্ণ সেই বুনোপথে চলতে চলতে হঠাৎ এক পশলা (বৃষ্টি) বৃষ্টি আমাদের চলার পথেই সবকিছু ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তাতে সেই বুনো পথ কাদামাখা হয়ে গেলো আর ঝোপঝাড়ের পাতা থেকে রক্তচোষা জোঁকের দল আমাদের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। কখন যে কাপড়ের ভিতর কামড় মেরে আমাদের দেহ থেকে রক্ত চুষে খেয়েছে, রক্ত ক্ষরণের ধরণ দেখেই কেবল বুঝতে পারি প্রাণীগুলো কতো নিষ্ঠুর। একনাগারে প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটার পর হঠাৎ জঙ্গলবেষ্টিত একটা ছোট্ট গ্রামের মতো লোকালয়ে পৌঁছুতে পারলাম। স্মরণ হলো— পাঁচ ঘজ্যা আদাম (পাঁচ পরিবারের গ্রাম)। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সব মিলিয়ে তখন সাত-আট জনের মতো মানুষ ছিল। তারা আমাদের দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ঘাম আর বৃষ্টির জলে ভিজে জবুটবু অবস্থায় আমাদেরকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে তারা সবাই যেন থ হয়ে গেছে।

আমি একজনকে বললাম, কেউ আমাদের একটু পানীয় জল দেবেন? তখন তৎক্ষণাৎ একজন মাঝবয়সী লোক একটা কুট্টি নিয়ে আমাদের এগিয়ে দিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পথে জল পান করলাম। আমি তাদের কুশলাদি জানতে চাইলে তারা আমাদের সকলের হাতের বাঁধন দেখে মলিন মুখে শুধু 'হ্যাঁ' বলে জবাব দেন। কিছুদূর দক্ষিণ দিক বরাবর চলার পর এবার সেই বড় মোনটার ঢাল বেয়ে নিচে নামার পালা। কিছুদূর নামার সময় সাত আট জনের মত বাঙালি শ্রমিকের মুখোমুখি হলাম। গাছের গুড়ি পাহাড়ের নিচে নামানোর কাজে তারা সবাই ব্যস্ত। স্থানীয় গ্রামের পাহাড়ি কাঠ ব্যবসায়ী ঐ কাজে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে এসে কাজে লাগাচ্ছিল। পাহাড়ের ঢালু পথ যেন শেষ হতে চায় না। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মতো নামতে থাকায় এবার পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। খালি একটা ঘাসে ভরা জমি, মৌসুমের সময় ধান বুনা হয় মনে করলাম। মাঝে মাঝে আইল বাঁধা। সূর্য তখন প্রায়ই ডুবু ডুবু। ঘড়িতে তখন বিকেল পৌনে ছ'টা। আমরা সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লাম।

আমাদের সতীর্থ নৈতিকদার তখন তীব্র গরমে মাথা ব্যথা পেয়েছে। আমাদের বসার জমিতে ছোট্ট একটা জলের ধারা বহমান ছিল। কিন্তু সেই জল দিয়ে মাথা ভেজানোর মতো অবস্থা ছিলনা। পাশের টিলার উপর একটা কুঁড়েঘর থেকে একটা মাঝারি আকারের কলস এনে হাতের তালু দিয়ে কলসটা পূর্ণ করেই নৈতিকদার মাথায় কোনো রকম জল দিতে সক্ষম হলাম। তারপর সূর্য ডুবে গেছে। দিনের আলো তখনো পরিষ্কার অপহরণকারীদের একজন তার সতীর্থদের বললো, আমরা দু'জন খাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আর তোমরা অতিথিদের নিয়ে কিছু সময় পর গ্রামের দিকে চলে আসো—বলে তারা দুজন চলে গেলো। দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে মিনিট বিশেক পর আমরাও সবাই চলতে লাগলাম।

পথে পনেরো মিনিট হাঁটার পর জমির পাড়ে একটা মাচান ঘরের উঠানে পৌঁছুলাম। বেলাশেষে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বাড়িতে উঠে গেলাম। ইজোরের মাঝখানে একটা তলই বিছানো তার ওপর একটা মাদুর। আমাদের পাঁচজনকে সেখানে বসতে বলা হলো। মাঝখানে একটা কেরোসিনের চেরাগ জ্বলছিলো। প্রদীপের আলোতে আমি লক্ষ্য করলাম যুবকদের দু'জনের হাতে দুটো গাদা বন্দুক, একজনের হাতে



পাইপগান আর বাকি দু'জনের হাতে দুটো কিরীচ (ধারালো লম্বা তলোয়ার সদৃশ হাতিয়ার)। হঠাৎ গৃহকর্তা তার দুই ছেলেসহ জুম থেকে ফিরে আসামাত্র আমাকে দেখে নমস্কার দা বলে তাকিয়ে থাকলেন। আবারো তৎক্ষণাৎ আমাদের হাতের বাঁধনগুলো দেখতে পেয়ে একদম রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়ে শেষঅবধি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় মিনিট দশেক পর আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসা হলো, অপহরণকারীদের মধ্যে থেকে একজন আমার কাছে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো, কাকা এখন খাবার সময় আপনাদের বাঁধনগুলো একটু খুলে দিই বলে খুলে দিলো। এভাবে আমাদের সকলের হাতের বাঁধন খুলে দিলো। তখন আমরা ক্ষণিকের হলেও স্বস্তি বোধ করলাম।

খাবারের থালাবাটি সব আমাদের সামনে দেওয়া হলো। সাথে তরকারি ছিল—জংলি আলু, পদনা বাচ্চুরী, নেলম পাদা, আর ঝিড়ি থেকে সংগ্রহ করা ছোট ছোট চিংড়ির সাথে ছোট মাছের রান্না করা তরকারি। এদিকে প্রায় সবাই দীর্ঘ দুর্গম পথ, তীব্র গরমে চড়াই-উঠরাই পেরিয়ে বৃষ্টি আর ঘামে ভেজা পোশাক নিয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের কথা মাথায় নিয়ে পেটের ক্ষুধা স্বাভাবিকভাবে ক্ষীণ বলা চলে। আমি অতি কষ্টে বেঁচে থাকার তাগিদে পাতে দেয়া ভাতের প্রায় অর্ধেক মতো খেতে পেরেছি। বাকিরাও প্রায় একই অবস্থাতে। কিছুক্ষণের পর একই সেই ব্যক্তি আবারো 'কাকা কিচ্ছু মনে করবেন না' বলে আমাদের একে একে সকলকে আগের মতো রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। অতঃপর, আমাদেরকে মাটিতে নামতে বলা হলো, আমরা অমনি একে একে সবাই গাছের মই বেয়ে বাড়ি থেকে উঠোনে নেমে পড়লাম। তারপর তাদের লম্বা সারির ফাঁকে ফাঁকে আমাদের এক একজন করে ঢুকিয়ে চলতে বললো।

এভাবে প্রায় পনের বিশ মিনিট হাঁটার পর রাতের আঁধারে টিলার ঢালুতে একটা টিনের ছাউনীর বাড়িতে পৌঁছুলে সেখানে আমাদের উঠতে বলে। আমরা সবাই সেই মাচান বাড়িতে উঠে গেলাম।

একপর্যায়ে প্রীতি কুমার চাকমা নামের জনৈক চুক্তি বিরোধী পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমার সামনে এসে বসলো– দাদা কেমন আছেন? আমি জবাব দিলাম—তোমরা যেভাবে রেখেছ আরকি! সে আবারো বললো– দাদা, রাত্রে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমি বললাম, জীবন-যৌবন বিসর্জন দিয়ে অদ্যাবধি আমাদের মাটি আর জুম্ম জাতির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি, আমরা তো অপরাধী হতে পারি না, পালিয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। সে আর কথা না বলে কাচু মাচু মুখে ঠিক আছে, সকালে দেখা হবে বলে চলে গেলো। আমরা তখনও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যার যার মতো করে বিছানায় বসে আছি। আবারো হঠাৎ একজন লোক এসে আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বললাম, কোথাও যেন দেখেছি মনে হয়।

তিনি আবার বললেন—দাদা আমার নাম ভদ্রশীল। বাদলছড়ি বাড়ি। আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম তখন আমার আরেক ভাইয়ের সাথে দিদির বাড়ি বেড়াতে গেলে সেখানে আপনার সাথে দেখা হয়। আপনি তখন আমাদের ভালো ভালো পরামর্শসহ বই, খাতা ক্রয় করার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছেন। আমরা সেই কথা এখনো স্মরণ করি। আজকে চুক্তি বিরোধীরা আপনাদেরকে আটক করেছে জেনে আমরা সমগ্র এলাকার মুরুব্বীদের নিয়ে অভিলাষ বাবুর সাথে বৈঠক করি। মেম্বার, চেয়ারম্যান, হেডম্যান, কার্বারী সবাই মিলে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ওরা আমাকে একজন সঙ্গী নিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে। রাতের আঁধারে টর্চ লাইট নিয়ে আপনাদের খবর জানতে এখানে পাঠানো হয়। আবারো আমাদের রাত যতই গভীর হোক আপনাদের ভালো-মন্দ খবর সেখানে নিয়ে যেতে হবে। ওরা অপেক্ষা করে থাকবে।

তিনি আরো বললেন—দাদা, আপনারা কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আগামীকাল আপনাদেরকে সসম্মানে বাড়ি যেতে দেবে। আমরা তার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শোনার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেলেন। আমরা আশ্বস্থ মনে সবাই শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সবকিছুর পরও এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়? যাক, আমরা সবাই কমবেশি ঘুমোতে সক্ষম হয়েছি। ভোরের আলো ফুটার আগে আমি চোখ মেলে বাইরে তাকালাম। জনা চারেক যুবক আমাদের পাহারায় রয়েছে, হাতে গাদা বন্দুক, পাইপগান আর কিরীচ হাতে বাড়ির উঠোনের কাঁঠাল গাছটার নিচে।

এভাবে সকাল হয়ে এলো আমরা সবাই জেগে থাকলেও বিছানার উপর বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল– গৃহকর্তা আর ওর বৌ আমাদের জন্য ঘটি আর জগে ভরে জল রেখে দিচ্ছেন। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। গ্রামের অপরাপর বাড়িগুলোতে নারী-শিশুদের গলার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। সকাল প্রায় সাড়ে আটটার দিকে আমাদের জন্য খাবার আনা হলো। ভাত আর তরকারি। আমাদের খাবার গ্রহণ করার সময় কথিত প্রীতি কুমার দাঁত ব্রাশ করতে করতে পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো—রাতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, জবাবে আমি বললাম—রাতে যেমন গরম, তেমনি মশারি ছাড়া ঘুমানো খুবই অস্বস্তিকর ছিল।

সে কোনো কথা না বলে শুধু একটি কথা বলে চলে গেল, আজ দুপুরে তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা আপন মনে



যার যে সাধ্য মতো ক্ষীণ আশায় বসে থাকলাম। বসে বসে এভাবে ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেলো। আমাদের পাহারায় তখন চোখে পড়লো জনা চারেক যুবক হাতে অস্ত্র বলতে পাইপগান, গাদা বন্দুক আর কিরিচ। সাথে সাথে হাই তুলে আমাদের কাছ থেকে প্রায় সাত আট হাত দূরে ঘরের বেড়াতে হেলান দিয়ে বসে থাকে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকি যে, দুপুরে ছেড়ে দেয়ার কথা বলে গেলো কিন্তু এতক্ষণেও নতুন কারো আনাগোনা নেই।

এভাবে বসে থাকতে থাকতে ঘড়িতে বেলা ১টা বেজে গেলো। কোনো খবর নেই, কিন্তু আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন দুশ্চিন্তার উদ্রেক হতে থাকলো। বিকেল ৩টা, না, তাতেও কোনো নতুন খবর নেই। আমাদের মনে কিন্তু দুশ্চিন্তার মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে, কিন্তু মুখে কাউকে বলার কিছুই নেই। এভাবে অস্বস্তিভরা প্রতীক্ষার পর বিকেল চারটা পনের মিনিট বেজে খাবার পর দু'জন যুবক আমাদের অবস্থানের দিকে দ্রুত পায়ে আসতে দেখে সবাই আশ্বস্ত হলাম। ঠিকই তারা বাড়ির উঠোনে পৌঁছামাত্র পাহারারত সঙ্গীদের বললো অতিথিদের পানছড়ির দোকানে নিয়ে যেতে বলেছে তাদের বড় দাদা, বাঁধনগুলোও খুলে দিতে বলেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দিয়ে তাদের কথামতো পানছড়ির দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম তাদের সামনে পিছিয়ে করে।

পনের মিনিটের মতো হাঁটার পর পানছড়ি দোকান সংলগ্ন প্রকান্ত একটা বটগাছের নিচে একটা মাচানের উপর বসে বসে স্থানীয় কয়েকজন মুরুব্বীদের নিয়ে কথা বলতে দেখা গেলা অভিলাষ বাবুকে। আমাদের দেখে দ্রুত বসা থেকে উঠে এসে আমাদের সকলের সাথে করমর্দন করলেন আর হাসিমুখে জানতে চাইলেন কেমন আছি বলে। আমরা যার যার মতো করে জবাব দিলাম। তারপর সোজা দোকানের পাশে একটা বাড়িতে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে সবাই একসাথে বসতে বলা হলে বসে পড়লাম। সবার অজান্তে আমি যদুদাকে আগেভাগে বলে রেখেছিলাম যে, অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে যেই ধরনের কঠিন শর্ত আরোপ করা হোক না কেন, যাতে সহজেই আমরা মেনে নিই। মোটকথা আমাদের ছাড় পাওয়াটাই মুখ্য। আলাপকালে অবশ্য যদুদা তাদের দেয়া শর্তগুলোর মধ্যে সবটাই যুক্তি সহকারে খণ্ডন করে দিলেন। তারপরেও অগত্যা কয়েকটা শর্ত বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দিতে চাইলে আমরা সেই শর্তগুলো মুখে কিছু না বলেই হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে থাকি। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের জিম্মিদশা থেকে মুক্তি লাভের পর আমরা কেউ পার্টির (জনসংহতি সমিতির) কাজ করতে পারবো না। তাদের আলাপচারিতায় বুঝা যায়— ১. তারা সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রাক্কালে যদি আমরা কোনো প্রকার অস্ত্র এবং গোলাবারুদ গোপনে গচ্ছিত রেখে থাকলে ঐসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ যাতে তাদের কাছে হস্তান্তর করে থাকি।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে অভিলাষ বাবু চিরচরিত হাসি মুখে বলতে লাগলেন, দাদা আগামীকাল চলে যাবেন, আজ রাতটা থেকে যান। আমি বললাম—আমাদের মধ্যে কয়েকজন সার্জারির রোগী আছি কিন্তু ঔষধপত্র সব বাড়িতে। তাছাড়া পরিবারে কী ঘটছে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের আন্দাজ থাকবে। আমি বললাম, বরং বৃষ্টি পড়া শুরু হলেও আপনাদের সম্মতি দিলে আমরা এখনই রওনা দিতে পারি। তখন ঝোড়ো বাতাস শুরু হয়ে গেছে। অভিলাষ বাবু বললেন, তাহলে দু'জন গাইডের ব্যবস্থা করে দিই। আমি বললাম, নিতান্তই গাইড না পেলেও আমরা নিজেদের গাইড করে যেতে পারবো। তখন উনি বললেন, ঠিক আছে একজন গাইড দিচ্ছি, আপনারা তাহলে যেতে পারেন যেমনটা আপনাদের ইচ্ছা।

ভারী বৃষ্টির মাথায় নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। কাদামাখা রাস্তা ধরে সবাই একসাথে চলতে চলতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা কাউখালী উপজেলার ঘিলাছড়ির শামুক্যাতে এসে একটা দোকান দেখতে পেলাম। ততক্ষণে ঝড়োহাওয়ার বেগ কমে গেছে। ঘড়িতে তখন ছয়টা। অবিরাম চলতে চলতে প্রায় আধঘণ্টা পর কাউখালী বাজারের উত্তর দিক থেকে রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটা টিউবওয়েল থেকে জল তুলে সবাই হাত, মুখ, পায়ের কাদা ধুয়ে নিলাম। তারপর জলে ভেজা জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পরই কাউখালী বাজার প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করার সাথে সাথেই সেই সন্ধ্যাকালীন বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে সোহেল চৌধুরী নামের জনৈক প্রাক্তন পিসিপি নেতার দেখা হলো। উনি অকস্মাৎ আমাদের কাদামাখা বৃষ্টির জলে ভিজে জবুটবু অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে আমাদেরকে দেখছিলেন। কাছে আসতেই করমর্দন করে আমি বললাম—ভাই এক্ষুনি আমাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেন।

শেষমেষ একটা চাঁদের গাড়ি ঠিক করা গেল। ভাড়া আটশত টাকা। রাঙ্গামাটিতে আমাদেরকে যার যার বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়ার শর্তে। অমনি আমরা সোহেল চৌধুরীকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম।

এভাবে ইউপিডিএফ গঠিত হওয়ার পর থেকে জনসংহতি সমিতির অসংখ্য সদস্য ও সমর্থকদের অপহরণ করে চলেছে। তাদের মূল কাজ হচ্ছে চুক্তি পক্ষীয় লোকদেরকে অপহরণ, হত্যা, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায় করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা।



ক বি তা

পাহাড়ে আলোর প্রদীপ

॥ শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ॥

অন্ধকারের বুক চিরে
তুমি এসেছিলে আলোর প্রদীপ হয়ে,
পাহাড়ের নিভৃত জনপদে,
অধিকারহারা জুম্ম জনগণের মাঝে।
অদম্য সাহস আর মুষ্টিবদ্ধ শপথে
শিখিয়েছিলে রুখে দাঁড়ানোর ভাষা,
জাগিয়ে তুলেছিলে ঘুমন্ত বিবেক,
বুনেছিলে মুক্তির দুর্নিবার প্রত্যাশা।

হে মহান নেতা,
তুমি মহাবিপ্লবী,
তুমিই জুম্ম জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা।
আজ তুমি নেই পৃথিবীর বুকে,
তবু তোমার আদর্শের দীপ্ত আলোকরশ্মি
আজও পাহাড়ের আকাশে ধ্রুবতারার
মতো দিশা দেখাচ্ছে
অধিকারহারা মানুষের অন্ধকার যাত্রায়।

১০ই নভেম্বর
ইতিহাসের বুকে লেখা এক কালোরাত্রি
ক্ষমতার ক্ষুধা, স্বার্থের লোভে
গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের
নিষ্ঠুর অন্ধকারে ঝরে পড়েছিল লারমার প্রাণ।
সেদিন লারমাকে হারানোর শোকে
আর্তনাদে কেঁপে উঠেছিল সমগ্র পাহাড়,
ঝিরি-ঝরনার কলতান থমকে গিয়েছিল,
বনভূমির বাতাসে নেমেছিল বিষণ্নতা,
আর পাহাড়ের প্রতিটি প্রান্তরে
ছড়িয়ে পড়েছিল শোকের দীর্ঘ ছায়া।

হে লারমা,
তুমি এই পাহাড়ের মাটিতে
বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলে,
সেই বীজ আজও অঙ্কুরিত হয়
জুম্মদের প্রতিবাদী হৃদয়ের গভীরে।
তাই তুমি আজও বেঁচে আছো
এক অনির্বাণ প্রদীপ হয়ে,
সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে,
অধিকার আদায়ের অমোঘ প্রেরণা হয়ে।
এই পাহাড়, এই ঝিরি, এই ঝরণা,
বনভূমির প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস
আজও যেন তোমার নাম ধরে ডাকে।

হে উজ্জ্বল নক্ষত্র,
তোমার চেতনার মৃত্যু নেই,
তোমার আদর্শের কোনো সমাধি নেই।
অধিকারহারা মানুষের বুকে
তোমার স্বপ্ন আজও জেগে আছে
অমলিন প্রত্যয়ের দীপ্ত শিখা হয়ে।
পাহাড়ের মতো গুরুগম্ভীর আকাশে
যতই জমুক কালো মেঘের ভার,
যতই নেমে আসুক দুঃসময়ের অন্ধকার,
তোমার আদর্শের অগ্নিশিখা
অন্ধকারের বুক চিরে পথ দেখাবে।
অসীম সাহস আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে
এগিয়ে আসবে অধিকারপিপাসু তরুণ সমাজ,
বুকে ধারণ করবে তোমার স্বপ্ন,
চোখে আঁকবে মুক্তির নতুন প্রভাত।

হে মহান বিপ্লবী,
আজ যৌবনের রক্তে জেগেছে
বিপ্লবের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।
প্রতিবাদের প্রতিটি সুরে
ধ্বনিত হচ্ছে বিপ্লবের মহাসংগীত,
শত তরুণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে
জেগে উঠছে অধিকার আদায়ের প্রত্যয়।
কালো মেঘের আড়াল ভেদ করে
আজ রক্তিম সূর্য জেগে উঠেছে,
পাহাড়ের মুক্তিকামী তরুণেরা
ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে চলেছে
এক ক্লান্তিহীন, দীর্ঘ সংগ্রামের পথে...
বুকে স্বপ্ন, চোখে আগামীর আলো,
হৃদয়ে অদম্য সাহস,
আর শিরায় শিরায় মুক্তির স্পন্দন।



হে মহাজাগতিক নক্ষত্র,
তোমার শূন্যতা আজও কেবল শূন্যতা নয়,
এ এক গভীর বেদনার ক্ষত!
এক মহান আদর্শকে হারানোর হাহাকার।
তোমাকে হারিয়ে পাহাড় হারিয়েছে
তার স্বপ্নের এক দুর্দমনীয় কণ্ঠ,
তার সংগ্রামের এক দীপ্ত অধ্যায়।
তবু তোমার প্রস্থান মানেই সমাপ্তি নয়,
তোমার নীরবতা মানেই পরাজয় নয়,
মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে
তুমি এক অবিনশ্বর চেতনা,
এক অসীম আদর্শের নক্ষত্রলোক।

হে লারমা,
তুমি কেবল একজন নেতা নও,
তুমি পাহাড়ের বুকে জ্বলে থাকা
এক অমর বিপ্লবের নাম।
তুমি সেই প্রদীপ,
যার আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে
অন্ধকারের বিরুদ্ধে কথা বলে।
তুমি সেই নক্ষত্র,
যার দীপ্তি মুছে দিতে পারবে না
সময়, মৃত্যু কিংবা বিস্মৃতি।

যত দিন পাহাড়ের বুকে ঝরনা বয়ে যাবে,
যত দিন বাতাসে বনভূমির দীর্ঘশ্বাস ভাসবে,
মহান নেতা, তুমি থাকবে পাহাড়ের আকাশে
এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে,
জুম্ম জাতির হৃদয়ে
এক অনির্বাণ আলোর প্রদীপ হয়ে।

পাহাড়ের জীবন

॥ উদ্দীপন চাকমা ॥

আমাদের জীবনচক্র

ধর্ষণ হবে
তারপর মিছিল হবে
স্লোগানে কাঁপবে পাহাড়
পথে পথে জমবে মানুষের ঢল।

মিছিলের ভিড়ে
হঠাৎ ব্রাশফায়ারে
কয়েকটি তরুণ প্রাণ
নামহীন সংখ্যায় পরিণত হবে।

তারপর
ঘর পুড়বে, দোকান পুড়বে
ছাই হয়ে যাবে মানুষের স্বপ্ন
লুট হয়ে যাবে
বছরের পর বছর জমানো সামান্য সঞ্চয়।

আবার মিছিল হবে
আবার প্রতিবাদ
আবার সমাবেশ
আবার মাইকে উচ্চারিত হবে-
'তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ'।

রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা
তখন কাকের মতো সভা বসাবেন
কেউ বলবেন, 'দুঃখজনক'
কেউ বলবেন, 'তদন্ত হবে'
কেউ বলবেন, 'কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

তারপর
তিনজন, চারজন, পাঁচজনের
একটি 'তদন্ত কমিটি' গঠিত হবে।

হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরবে
এসি গাড়ির দরজা খুলবে
কমিটি নামবে পাহাড়ে



ছবি উঠবে
খাতা খুলবে
কিছু প্রশ্ন করা হবে।

ভুক্তভোগীর হাতে তুলে দেওয়া হবে—
দুই কেজি চাল
আধা কেজি লবণ
৫০০ টাকার একটা নোট
আধা লিটার তেল
একটি সাবান।

তারপর?
ক্যান্টনমেন্টে মধ্যাহ্নভোজ
তারপর সংবাদ সম্মেলন।

ক্যামেরার সামনে—
কিছু চেনা মুখ
কিছু চেনা প্রশ্ন
কিছু চেনা উত্তর—
'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।'

যমুনা টিভি
পার্বত্যনিউজ
যুগান্তর, সমকাল, প্রথম আলো
সিএইচটি টোয়েন্টিফোরডটকম
আরও নাম অজানা পত্রিকায়—
শিরোনাম হবে
খবর হবে
তারপর খবর বদলে যাবে।

পাহাড়ও ধীরে ধীরে
চুপ হয়ে যাবে।

জুমবীরা জুমে যাবে
রাস্তায় মানুষ ফিরবে
দোকান খুলবে
বিদ্যালয়ে ঘণ্টা বাজবে—
যেন কিছুই ঘটেনি।

শুধু যে ঘরটি পুড়েছিল
সেটি আর আগের মতো হবে না।

যে মায়ের সন্তান ফিরবে না
তার উঠোনে আর কোনোদিন
আগের মতো সন্ধ্যা নামবে না।
তবু ক্যালেন্ডার ঘুরবে।

আবার কোনো একদিন
কেউ আক্রান্ত হবে
আবার মিছিল হবে
আবার গুলি
আবার আগুন
আবার তদন্ত কমিটি
আবার দুই কেজি চাল
আবার ৫০০ টাকার নোট
আধা কেজি লবণ
আধা লিটার তেল
একটি সাবান।
তারপর আবার সংবাদ সম্মেলন।

তারপর আবার-
'পাহাড়ের জনজীবন স্বাভাবিক।'

এই তো আমাদের জীবনচক্র—
অপরাধ
প্রতিবাদ
রক্ত
তদন্ত
ত্রাণ
সংবাদ সম্মেলন
তারপর নীরবতা।



বিবর্ণ পাহাড়ের হাহাকার

॥ ইমন চাকমা॥

বিভীষিকাময়, বিবর্ণ পাহাড়
শকুনের আঁচড়ে পড়া ছায়ায়
ক্ষতবিক্ষত আজ সবুজের বুক
নিস্তব্ধ অরণ্যের ভাঁজে ভাঁজে
আজো প্রতিধ্বনিত হয়
কত মানুষের আর্তনাদ।

ষাট দশকের কাপ্তাই বাঁধে
ডুবে গেছে ঘর, ভিটে
ডুবে গেছে কত স্মৃতির অগণিত অধ্যায়
হারিয়ে গেছে পূর্বপুরুষের পদচিহ্ন!

কত আর্তনাদ, কত হাহাকার
স্ব-ভূমিহারা নিপীড়িত মানুষ
আজও বহন করে নির্বাসনের ক্ষত
উচ্ছেদ হওয়ার যন্ত্রণা
সময় মুছে দিতে পারেনি,
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে
বরং তা হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের অগ্নিশিখা।

পাহাড় আজ নীরব নয়
অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে
জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে
অধিকার আদায়ের আন্দোলনে
দুর্বার স্রোতের মতো বহমান।
শিকড়, ভূমি, অধিকারের দাবিতে
উচ্চারিত হয় প্রতিবাদের বজ্রকণ্ঠ।

একদিন শকুনের ছায়া সরে যাবে,
আবার সবুজ হবে পাহাড়
মাটি, মানুষ আর অধিকারের
জাগবে নতুন ভোর।

বিপ্লবী প্রেমিক

॥ শুভময় তঞ্চঙ্গ্যা ॥

১৯৩৯-এর ১৫ সেপ্টেম্বর,
রাঙামাটির মহাপুরমে জন্ম নিলেন এক সন্তান,
পাহাড়ের মাটি আর মানুষের ভালোবাসায়
বেড়ে উঠলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা—
যাঁর হৃদয়ে ছিল মানুষের অধিকার আর স্বপ্নের গান।

বঞ্চিত পাহাড়ের মানুষের কণ্ঠ হয়ে
তিনি নেমেছিলেন সংগ্রামের পথে,
১৯৭২-এ সংসদে দাঁড়িয়ে
তুলেছিলেন জাতিসত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা।
গড়ে তুলেছিলেন সংগঠন, জাগিয়েছিলেন মানুষ,
ন্যায় ও মর্যাদার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন পাহাড়কে।

তিনি ছিলেন বিপ্লবী,
আবার ছিলেন মানুষের প্রেমিক
পাহাড়, মাটি আর মানুষের জন্য
নিজের জীবনও করেছিলেন উৎসর্গ।

কিন্তু ইতিহাসে এলো সেই কালো দিন—
১০ নভেম্বর ১৯৮৩।
নির্মম হত্যায় থেমে গেল তাঁর জীবন,
নিভে গেল এক বিপ্লবীর দীপ।

তবুও তিনি হারিয়ে যাননি—
পাহাড়ের বাতাসে, মানুষের হৃদয়ে
আজও বেঁচে আছে তাঁর নাম,
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা—
এক অমর বিপ্লবী প্রেমিক।



পিষ্ট পাহাড়

॥ সম্রাট সুর চাকমা ॥

সবুজ বটবৃক্ষের তলে ভাবনায় যখন মগ্ন থাকি,
লাল কৃষ্ণচূড়া আর নীল আসমানের সমারোহে ফুটে ওঠে
তোমার ঐ নিষ্পাপ হৃদয়ে আঘাত করা
হিংস্র হায়েনাদের বেপরোয়া উন্নয়নের ডামাদোল।

ঐ দূর পাহাড় থেকে ভেসে আসা বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার,
শাসকের পিষ্ট হওয়া মানুষের আর্তনাদ;
কে বা শুনে সরল-সিধে মানসিকতার করুণ পরিণতির বার্তা?
স্মার্ট বাংলাদেশের চাপা পড়া পাহাড় খেকো উন্নয়নের।

ঘুমধুম থেকে ধুধুকছড়া, পাহাড় থেকে সমতলে
আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে পথে,
চেঙ্গী-মাইনী-কাচালং-শঙ্খ-মাতামুহুরি-কর্ণফুলির উজানে
সভ্যতার মোহনার বাঁকে বাঁকে;
মেহনতি মানুষের কত যে শ্রম, রক্ত ও ঘাম মিশে আছে।

শত-সহস্র গণমানুষের রক্তে রঞ্জিত পাহাড়
কত মা-বোনের ইজ্জত, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়েছে কেড়ে
সেনা-সেটেলার কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যায়;
লংগদু-নানিয়াচর-লোগাং-খাগড়াছড়ি
কলমপতি-ভূষণছড়া-মহালছড়ি
কত কী আরও,
বাদ যায়নি পাহাড়ের একটি কোণাও।

হে তরুণ!

॥ ইনজেব চাকমা ॥

হে তরুণ! তোমরা নিশ্চয় জানো
শোষণমুক্ত আলোকোজ্জ্বল কল্যাণময়
ন্যায়নিষ্ঠ জীবনই জীবন;
তবু কেন খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো
জীবনকে করেছো তিলে তিলে ক্ষয়।
হে তরুণ! তোমরা তো প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী
অসত্য, অন্যায়কে পদদলিত করে
পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে
সত্য সুন্দর সমাজ গড়বে পৃথিবী।
হে তরুণ! নদীর বহমান ধারার মতো
সামনে হেঁটে চলো অবিরাম,
তোমরা তো পৃথিবীর অবিচল শক্তি
দমে যেওনা, স্থির হয়ে থেকোনা
নির্যাতিত শোষিত জুম্ম জাতিকে
দিতে হবে ত্রাণ।
হে তরুণ! হাজার প্রতিকূলতাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে
দুঃসাহসিকতার সাথে দুর্জয়কে কর জয়,
বিপদসংকুল অন্ধকার পেরিয়ে
জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে
আলোকোজ্জ্বল কর পাহাড়কে।
হে তরুণ! তোমরা জাতির আশা-ভরসা
জুম্ম জাতির শক্তির মূল উৎস
সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ জাতির সন্ধান দিতে
তুমিই একমাত্র হাতিয়ার।



বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারের তিনটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন সম্পর্কে

(ক) পাবত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

প্রিয় পার্বত্যবাসী,

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত তিনটি কমিটি "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি", "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি" ও "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি" গঠন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে এধরনের কমিটি গঠন করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের কমিটি বিষয়ক অধিশাখার অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক) মো: হুমায়ুন কবির কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ গেজেটে এই তিনটি কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়।

তিনটি কমিটির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে অর্থ ও পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, ভূমি, আইন, বিচার ও সংসদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবৃন্দ রয়েছেন। কমিটিতে পররাষ্ট্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীদ্বয় এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে রাখা হয়েছে। কমিটিতে আরো রয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, তিন পার্বত্য জেলার সাংসদবৃন্দ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালকদ্বয়। জাতীয় কমিটিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপদেষ্টাকে প্রধান সমন্বয়ক ও ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালককে সদস্য-সচিব করা হয়েছে।

জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং আন্তঃসংস্থা বাস্তবায়ন তদারকিকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাসমূহের কার্যপরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারণ; এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে ভূমি, আইন, বিচার ও সংসদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ রয়েছেন। এছাড়া এ কমিটিতে রয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), আনসার ও ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি (ভিডিপি) এর মহাপরিচালকবৃন্দ। রয়েছেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ অব পুলিশ (এসবি), এনএসআই ও সোশ্যাল স্টাবিলিটি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (এসএসআইবি)-এর মহাপরিচালক/ পরিচালকবৃন্দ। নির্বাহী কমিটিতে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালককে প্রধান সমন্বয়ক ও এসএসআইবি'র পরিচালককে সদস্য-সচিব করা হয়েছে।

নির্বাহী কমিটির অন্যতম কাজ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত আইন, চুক্তির শর্ত ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এবং নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান করা। তিন মাসের মধ্যে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দকে সদস্য হিসেবে রাখা রয়েছে।



পরামর্শক কমিটির কার্যপরিধি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করা।

প্রিয় সংগ্রামী জনতা,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ না নিয়ে নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়নের" কথা সন্নিবেশ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। এর মধ্য দিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে না দেখে তথাকথিত নিরাপত্তা, সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদের চোখে দেখছে বলে প্রতীয়মান হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে তা আরো জটিল করে তুলবে।

অধিকন্তু "পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত আইন, চুক্তির শর্ত ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এবং নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের" কথা উল্লেখ রয়েছে নির্বাহী কমিটির কার্যপরিধিতে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইনগুলোকে সংশোধন করার হীনউদ্দেশ্যেই এই কার্যপরিধি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরও জটিল ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কমিটিগুলোর গঠন, স্তরবিন্যাস এবং কার্যপরিধি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব কাঠামোতে সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিধানগুলোকে উল্টে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধানের জন্য গঠিত জাতীয় ও নির্বাহী কমিটিতে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ডিজিএফআই, এসবি, এনএসআই, এসএসআইবি প্রভৃতি সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে সদস্য হিসেবে রাখা এবং নির্বাহী কমিটির সচিবালয়ে ডিজিএফআই কর্তৃক প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা ও প্রয়োজনে সচিবালয়টি গোয়েন্দা সংস্থা/নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ন্যস্ত করার বিধান উল্লেখ থাকার বিষয়টি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

অন্যদিকে জাতীয় কমিটিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপদেষ্টাকে প্রধান সমন্বয়ক ও ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালককে সদস্য-সচিব এবং নির্বাহী কমিটিতে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালককে প্রধান সমন্বয়ক ও এসএসআইবি'র পরিচালককে সদস্য-সচিবের দায়িত্ব অর্পণ করা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। একটা রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানে গঠিত কমিটিতে এভাবে সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি রাখা নিঃসন্দেহে নজীরবিহীন ও গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করা যায়। এর ফলে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাটির সমাধানের পথ যেমন রুদ্ধ হবে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ব্যাপক সামরিকায়ন ও সেনাশাসন জোরালো হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের দীর্ঘদিনের সমস্যা জিইয়ে রেখে অধিকতর সামরিকায়নের মাধ্যমে জুম্মদের দমন পীড়নের পথ আরো সম্প্রসারিত হবে।

এই তিনটি কমিটির মধ্যে জাতীয় কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করা, নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা এবং পরামর্শক কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে সুপারিশ প্রদান করা। এখানে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে কোনো সিদ্ধান্ত নির্ধারণী ভূমিকায় রাখা হয়নি। এসব পরিষদকে রাখা হয়েছে কেবল পরামর্শক ও সুপারিশ প্রদানের মতো গৌণ ভূমিকায়। অপরদিকে, জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত বলে বিবেচনা করা যায় না।

আরো উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদেরকে পরামর্শক কমিটিতে রাখা হলেও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পরিবর্তে চেয়ারম্যানের প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিন সার্কেল চীফদেরকেও উক্ত কমিটিসমূহে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এছাড়া বিএনপি সরকার গঠনের পর এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, টাস্কফোর্স ও ভূমি কমিশন পুনর্গঠন করা হয়নি। কিন্তু সেসব কমিটির চেয়ারম্যানদেরকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।



অন্যদিকে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকায় রাখা হয়েছে জাতীয় কমিটি ও নির্বাহী কমিটির হাতে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলা নিয়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটিতে মন্ত্রীপরিষদের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং প্রশাসনিক বিভাগ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রাখা হয়েছে।

বস্তুত সরকারের কমিটি গঠনের এই উদ্যোগ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো বর্তমান বিএনপি সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়নের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার তথাকথিত সমাধানের নীতি গ্রহণ করতে চলেছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হচ্ছে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং এই সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধানের নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

প্রিয় অধিকারকামী জুম্ম জনগণ,

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত দীপেন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা ছিল পার্বত্য চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য (চট্টগ্রাম-৫) মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা ছিল চুক্তির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরোধাত্মক। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সরানোর দাবি করলেও সরকারের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আরো উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ১০২ দিনের মাথায় নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে দীপেন দেওয়ানকে বিগত পহেলা জুন পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

দীপেন দেওয়ানকে অপসারণের তিনমাস পর গত ২১ আগস্ট ২০২৬ বান্দরবান থেকে নির্বাচিত এমপি সাচিং প্রু জেরীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সাচিং প্রু জেরীকে পার্বত্য মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও গত ২৭ আগষ্ট ২০২৬ সরকার কর্তৃক কক্সবাজার জেলার আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পার্বত্য মন্ত্রী সাচিং প্রু জেরীকে প্রদান এবং তিন পার্বত্য জেলার দায়িত্ব প্রতিমন্ত্রী মীর হেলালকে প্রদান করা হয়। যার অর্থ হচ্ছে সাচিং প্রু জেরীকে পার্বত্য মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রতিমন্ত্রী হেলালের উপর ন্যস্ত রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বিধান রয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। বর্তমান সরকার এ পরিষদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এখনও এগিয়ে আসেনি। বরং নানা ক্ষেত্রে পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হলে ত্রাণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে যশোর-৩ আসনের সংসদ সদস্য এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অথচ পার্বত্য অঞ্চলের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্তই করা হয়নি।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) অবদান অনস্বীকার্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আনুষ্ঠানিক সংলাপের ধারাবাহিকতায় বিএনপি সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) সাথেও ১৩ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা সরকারের সাথে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমনকি ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলে পার্বত্য চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। সেসময় বিএনপি সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি' গঠন করে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০০৬ সালে 'জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়' ও 'রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট' দু'টি বিষয়/কার্যাবলী হস্তান্তর করে চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের প্রতি এই আহ্বান জানাচ্ছে যে—

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও পরামর্শক কমিটি অবিলম্বে বাতিল করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম



চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) গ্রহণ করা।

৪। প্রতিমন্ত্রী মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী পদ সংরক্ষণ না করা।

বি:দ্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রকাশিত ও প্রচারিত।

(b) Joint Statement of CHTC and IWGIA

CHTC and IWGIA Deeply Concerned over BNP Government's Policies That Risk Further Entrenching Military Control and Undermining the CHT Accord

22 September 2026 | The International Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC) and the International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) are deeply worried about repeated concerning initiatives undertaken by the current BNP-led government regarding Chittagong Hill Tracts (CHT). Recently, on 10 September 2026, the Cabinet Division of the Government of Bangladesh issued three gazette notifications of establishing a National Committee, an Executive Committee and an Advisory Committee on Chittagong Hill Tracts Affairs.

A careful examination of the composition, hierarchy and terms of reference of these committees reveals a framework dominated by the military, intelligence agencies and other national security institutions. Military and intelligence officials have been given central roles in formulating, coordinating and implementing national policy on the CHT.

This arrangement risks reversing the fundamental provisions of the CHT Accord. The Accord was intended to facilitate a transition from military control to civilian, democratic and regionally representative governance. The new committees appear to move in the opposite direction.

A security-dominated institutional structure with further securitised approach

Although the 19-member *National Committee* is chaired by Prime Minister Tarique Rahman, the Adviser responsible for the Ministry of Defence and the Armed Forces Division has been designated as Chief Coordinator, the Directorate General of Forces Intelligence (DGFI) as Member-Secretary, the Principal Staff Officer of the Armed Forces Division and the Director General of the National Security Intelligence as its members, among others. The military intelligence, DGFI has been tasked with providing the personnel and infrastructural facilities for the committee's secretariat.

This National Committee has been authorized to determine priorities concerning the CHT, supervise and coordinate activities, determine the scope of work and areas of operation of security forces, law-enforcement agencies and other organisations in the CHT, and formulate a national strategy on CHT.

The *Executive Committee* is even more heavily dominated by the security establishment. Although formally the Home Secretary has been placed as the Chair, the Director General of DGFI has been appointed its Chief Coordinator.



Its membership includes the Inspector General of Police, the Director General of National Security Intelligence (NSI), Directorate General of Forces Intelligence (DGFI), Border Guard Bangladesh (BGB) and Bangladesh Ansar and Village Defence Party (VDP), the General Officer Commanding of the Army's 24 Infantry Division, officials of the Armed Forces Division and Special Branch, and other senior security and intelligence officials.

This Executive Committee has been given the task of preparing a national CHT strategy addressing *"terrorism and separatism,"* and has been mandated to review the terms of the CHT Accord, and relevant rules and regulations, and to recommend amendments, reforms or new legislation which has been described as intended to achieve "*sustainable security"* of the region. As with the National Committee, the DGFI has been authorised to provide the personnel and infrastructural facilities for the Executive Committee's secretariat.

We find it deeply problematic that the decision **to review the terms of the CHT Accord has been placed within the mandate of a security-dominated body coordinated by the country's principal military intelligence agency.** The CHT Accord is a political agreement signed between the Government of Bangladesh and the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) following more than two decades of armed conflict. Therefore, any changes to its provisions, through a purported "review" that excludes one of the two parties to the agreement, namely, the PCJSS, would amount to a bad faith unilateral subversion of a truce that has gained political and humanitarian legitimacy within Bangladesh, and internationally. **A unilateral "review", unless acquiesced to by the other party, would amount to a clear breach of the agreement,** upon which the PCJSS, and consequently, the people of the CHT have acted, to their detriment, for the greater cause of peace, stability and development in the CHT and Bangladesh as a whole. It cannot legitimately be treated merely as another security instrument which can be reviewed by intelligence and law-enforcement agencies. **Any discussion of its provisions must involve the parties to the Accord and the institutions established under it and must be directed towards full and faithful implementation.**

The language and terms used in the gazette, "terrorism" and *"separatism,"* without acknowledging the political and historical roots of the CHT conflict and without mentioning anything about human- rights safeguards, also create a serious risk that peaceful political participation demanding Accord implementation, human-rights advocacy, and legitimate expressions of Indigenous identity may be treated as security threats.

The third body, the *Advisory Committee,* includes office-holders from several institutions associated with the CHT Accord. Their inclusion, however, should not be mistaken for meaningful or democratically mandated representation of the Indigenous Peoples of CHT. The three Hill District Council chairs appointed as members on the committee were appointed by the BNP-led government, not elected by the permanent residents of their respective districts. Their participation cannot substitute for an inclusive process through which Indigenous Peoples determine their own representation. The CHT Regional Council, meanwhile, is represented through a nominee of its Chair rather than the Chairperson being included in the committee. The committee also provides no designated representation for the three Circle Chiefs, or for headmen and karbaris, leaving the region's traditional institutions without a voice in its deliberations. Further, this Committee, with minimal representation from CHT institutions, is placed at the bottom of the institutional hierarchy compared to the other two Committees. It has been mandated with the task to submit recommendations to the security-establishment



dominated Executive Committee, which will then prepare the draft national strategy for consideration by the National Committee. This means that this Advisory Committee may advise, but security and intelligence dominated bodies will formulate and coordinate the policies.

The present government came to office promising democratic reform, political inclusion and an end to the authoritarian practices associated with the former Awami League government. After resuming office, Prime Minister Tarique Rahman and senior BNP leaders repeatedly mentioned the vision of building a "Rainbow Nation", where diverse communities of Bangladesh would be respected and included. Seven months have passed since the BNP-led government assumed office on 17 February 2026. It has still not announced a comprehensive and time-bound roadmap for implementing the unimplemented provisions of the CHT Accord. Implementation of the Accord was neither incorporated into the government's announced 180-day priority programme. Instead, it has just made a decision to review the terms of the Accord by a security-dominated structure under the coordination of the country's principal military intelligence agency.

The CHTC and IWGIA are deeply worried about all these approaches of the government concerning the CHT since it assumed office. First, **the government appointed a non-Indigenous State Minister,** Mir Mohammad Helal Uddin, in addition to an Indigenous Minister, Dipen Dewan, to the Ministry of Chittagong Hill Tracts (CHT) Affairs. This appointment of a non- Indigenous person at the CHT Affairs Ministry was against the spirit and intent of the CHT Accord. In a joint statement, we called for a review of this appointment[1]. However, instead of removing or transferring the non-Indigenous State Minister, Indigenous Minister Dipen Dewan was forced to resign from the Ministry as **he allegedly could not exercise the ministry's usual practice due to interference from the non-Indigenous State Minister,** as reported by news media[2]. Although, Saching Prue Jerry, another Indigenous representative from the Bandarban constituency replaced Dewan almost three months later, Helal Uddin still remains as State Minister of the same Ministry. Our concerns were further deepened by the government's decision on 27 August 2026 to allocate district-level supervisory responsibilities: **all three districts of CHT, Rangamati, Khagrachhari and Bandarban, were assigned to non-Indigenous State Minister Mir Helal Uddin,** while CHT Affairs Indigenous Minister, Saching Prue Jerry was assigned responsibility for Cox's Bazar, a district outside CHT.

Whatever administrative explanation may be offered for this district-allocation system, it raises questions that **the supervision and coordination activities of three CHT districts has been placed in the hands of a non-Indigenous state minister from outside the region.** This weakens both the principle of meaningful Indigenous representation and the authority as embodied in the Accord. It also emphasizes the idea that Indigenous representation is being retained ceremonially while effective authority is assigned elsewhere. With the latest formulation of three Committees on CHT Affairs and by entrusting many of the same security and intelligence institutions that have long been accused of human rights violations in CHT with central responsibility for designing the future national strategy for the CHT, it appears that the current government is following the same path as the Sheikh Hasina-led government: treating the political problem as a security problem, concentrating authority in the military and intelligence establishment, bypassing the institutions created by the CHT Accord, and postponing implementation of the Accord. De facto military control under executive order "Operation Uttoron (Upliftment)3", which was introduced



by the former Sheikh Hasina led government is already in place in CHT. Rather than ending this longstanding military control and strengthening the civilian institutions envisaged by the CHT Accord, **the formulation of the new Committees risks further institutionalizing the omnipotent de facto role of the military and intelligence officials at the core of national policymaking regarding CHT.**

The CHTC and IWGIA urgently call upon the Government of Bangladesh to:

1. **Review and suspend the operation of the three committees** until their structure and mandates have been discussed with the CHT Regional Council, traditional institutions, Civil Society Groups, and Indigenous women and youth representatives.
2. **Remove DGFI and other intelligence agencies from coordinating and secretarial control** and related roles over the bodies responsible for formulating national CHT policy.
3. **Withdraw the mandate given to a security-dominated committee to review the terms of the CHT Accord. Any discussion concerning a "review" of the Accord must take place with the consent of the PCJSS (one of the two signatories to the Accord), through political dialogue between the party and the government.**
4. **Publicly affirm that the CHT Accord will not be diluted, reinterpreted, or amended unilaterally** and that its full implementation remains government's priority.
5. **Without any further delay, announce a clear and time-bound roadmap for full implementation of the Accord,** with specific deadlines, mechanisms, and responsible institutions for public reporting.
6. **Reconstitute and activate the CHT Accord Implementation and Monitoring Committee** with the meaningful participation of the parties to the Accord.
7. **Make the CHT Land Dispute Resolution Commission fully operational,** adopt its operational rules without further delay and provide it with sufficient resources, officials and authority.
8. **Immediately form the Advisory Committee or Council to advise the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs** as mandated by [clause 18 of Part D of] the 1997 Accord, composed of the Minister, chairperson or representatives of the CHT regional Council and the three Hill District Councils, the three directly elected Members of Parliament from the CHT, the three Rajas or Chiefs and three members from non-tribal permanent residents from the three hill districts.
9. **Immediately revoke the executive order known as 'Operation Uttoron',** and take concrete steps to restore full civilian governance and a democratic environment in the CHT. All temporary military and security camps should be dismantled, with the exception of the six permanent military bases designated in the 1997 CHT Accord.
10. **Reverse the allocation placing all three CHT districts under the supervision of the non-Indigenous State Minister** and ensure that the Indigenous Minister for CHT Affairs possesses effective authority concerning the region.
11. **Invite and fully cooperate with the United Nations and its relevant special procedure mandate holders as well as the human rights treaty bodies** to investigate this longstanding and continued pattern of human rights violations in the CHT



(গ) ৫২ জন নাগরিকের যৌথ বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তিন কমিটি গঠন এবং সামরিকায়ন বৃদ্ধির আশংকায় নাগরিক সমাজের গভীর উদ্বেগ

অতিসম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনের নামে নতুন করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি' গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা জিইয়ে রেখে অধিকতর সামরিকায়নের মাধ্যমে পাহাড়িদের দমন পীড়নের পথ উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে ৫২ জন নাগরিক নিম্নোক্ত বিবৃতিতে প্রদান করেছেন।

"আমরা সকলে অবগত আছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। পাহাড়ের আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুরক্ষার দাবির বিষয় তোয়াক্কা না করে সেখানে সামরিকায়নের মাধ্যমে দমন পীড়নের পথ বেছে নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল বহুদিন ধরে। ষাটের দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ের প্রায় এক লাখ জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেনাক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ পাহাড়ের কৃষি উৎপাদন, জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জনমিতি এবং ঐ এলাকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যার ফলে আমরা দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সময় সশস্ত্র সংঘাত দেখেছি। সেই সংঘাতে সামরিক বেসামরিক বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বহু নিরীহ আদিবাসী ব্যক্তি ও পরিবার। বিভিন্ন সরকারের সাথে ধারাবাহিক ২৬ বার বৈঠকের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেলেও সেটি স্বাক্ষরের ২৯ বছর পার হলেও চুক্তির মৌলিক ধারাগুলি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ের আদতে কোন সুরাহা হয়নি।

ফলে পাহাড়ের সমস্যার কার্যত কোনো সমাধান এখনো হয়নি। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জোরালো দাবি ছিল-- পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পাহাড় থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহার করা। অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ভঙ্গুর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মধ্যে পাহাড়িরা অন্তত দুই বার রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছেন। সেখানে কমপক্ষে ৭ জন আদিবাসী প্রাণ হারান এবং মানবাধিকার লংঘনের শিকার হন অনেকেই। এমনি বাস্তবতায় নির্বাচনী ইশতেহারে বিএনপি প্রস্তাবিত 'রেইনবো নেশন' এর প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে পাহাড়ের মানুষ বিএনপি'র প্রতি একচেটিয়া রায় দিয়ে তিন জেলা থেকেই তিনজন বিএনপি প্রার্থীকে নির্বাচিত করেছেন।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, পার্বত্য চুক্তির অবলম্বনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এককভাবে সেই এলাকার কোন প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত হবার কথা থাকলেও বাস্তবে সেটা করা হলো না। বিশেষ করে চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মন্ত্রণালয়ে একজন অ-পাহাড়ী প্রতিমন্ত্রী নিযুক্তিতে পাহাড়ের জনসাধারণ আপত্তি জানালেও তাদের বক্তব্যকে আমলেই নেয়া হয়নি।

অধিকন্তু গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। যার একটিতে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, দ্বিতীয়টিতে স্বরাষ্ট্রসচিবকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি এবং তৃতীয়টিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিসমূহের মধ্যে উপরোক্ত দু'টি কমিটিকে সচিবালয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করবে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)। এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নির্লজ্জ ও কর্তৃত্বপরায়ণ পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি।

কারণ উপরোক্ত বিশেষ সংস্থার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের অধিকার হরণের চালিকাশক্তির ভূমিকা পালনের অভিযোগ ও ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। আশংকা করা যৌক্তিক যে, এর ফলে আদিবাসীদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেনা-শাসন আরও বেশি দমন-পীড়নের রূপে প্রকাশ পাবে। এ সবই বিএনপি'র প্রতিশ্রুত নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে যেমন সাংঘর্ষিক, সেইসাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একাধিকবার ঘোষিত 'রেইনবো নেশন' প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে বলে আমরা মনে করি। এর ফলে পার্বত্য তিন জেলার শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি ও স্থিতিশীলতা পুনপ্রতিষ্ঠার পথও রূদ্ধ হবার আশংকা সৃষ্টি হবে।

যদিও কমিটিসমূহের কার্যপরিধির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নিরাপত্তা



বিধান, সন্ত্রাস দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটিকে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। এই সুপারিশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি আগামী তিন মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশলের খসড়া প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিকে দেবে। এরপর জাতীয় কমিটি সেই কর্মকৌশল চূড়ান্ত করবে। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র সচিব এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত আইন, চুক্তির শর্ত ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এবং নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নে সুপারিশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যা আশাজনক বিবেচিত হলেও, গোয়েন্দা ও সেনা কর্তৃত্বের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনাধীন অবস্থায় উল্লেখিত কার্যাবলী ঘোষিত 'রেইনবো নেশন'-এর প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সহায়ক হবে আর কতটা সামরিকায়ন নিশ্চিত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের (১৯৯১-১৯৯৫) অবদান ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী সরকারের আলোচনার ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে তৎকালীন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার (১৯৯১-১৯৯৫) ১৩ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছিল শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে। যা পরবর্তীতে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির রূপ লাভ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এটা হয়েছিল নেহাতই ঐতিহাসিক সমঝোতা আলোচনার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সরকারের একটি বিশেষ মহল পার্বত্য বিষয়টিকে সেই প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় না নিয়ে আশির দশকের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে নিরাপত্তার চশমা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে এতে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদারে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও অশান্তিকে উস্কে দেবার অশুভ ছায়া লক্ষ করছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, অতীতের সরকারসমূহ সামরিক ও বেসামরিক আমলা কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেরকে দমন-পীড়নের মধ্যে রেখে শাসন করার চেষ্টা করেছে। তার বিপরীতে আমরা পেয়েছি সংঘাত, রক্তপাত, বিভেদ এবং বিদ্বেষের চাষ। সেই সংঘাত ও বিভেদ থেকে সরে এসে পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হিসেবে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে এসেও এ ধরনের সামরিক ও বেসমারিক আমলা কর্তৃত্বের প্রেসক্রিপশনে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করাটা হবে সেই উল্টো পথে যাত্রা যা কার্যত শান্তি ও সম্প্রীতির বিপরীতে পুনরায় সংঘাত ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টিতেই ইন্ধন যোগাবে, যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়।

এমতাবস্থায় আমরা সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সকল বৈধ প্রতিনিধির সাথে পুনরায় আলোচনা করে কমিটিগুলো গোয়েন্দা-নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে পুনর্গঠনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এবং একই সাথে সদ্য গঠিত কর্তৃত্ববাদী আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জোর দাবি জানাই।

বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেছেন—

১. আনু মোহাম্মদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ২. অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, মানবাধিকার কর্মী ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন; ৩. খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি; ৪. শিরীন পারভিন হক, সদস্য, নারীপক্ষ; ৫. ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআই-বি; ৬. আবু সাঈদ খান, লেখক ও সাংবাদিক; ৭. অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট; ৮. শহিদুল আলম, আলোকচিত্রী; ৯. শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি; ১০. ড. সুমাইয়া খায়ের, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১১. ড. সামিনা লুৎফা, অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১২. ড. জোবাইদা নাসরীন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৩. তাসনিম সিরাজ মাহবুব, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৪. ড. খাইরুল চৌধুরী, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৫. মাহমুদুল সুমন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; ১৬. ফারহা তানজীম তিতিল, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ১৭. রেহনুমা আহমেদ, লেখক; ১৮. অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট; ১৯. অ্যাডভোকেট তবারক হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোট; ২০. পাভেল পার্থ, লেখক ও গবেষক; ২১. ড. ঈশিতা দস্তিদার, নৃবিজ্ঞানী ও গবেষক; ২২. সায়দিয়া গুলরুখ, সাংবাদিক ও গবেষক; ২৩. এ্যাড. ইমতিয়াজ মাহমুদ, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; ২৪. মনিন্দ্র কুমার নাথ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ; ২৫. রোজিনা বেগম, গবেষক ও অধিকার কর্মী; ২৬. জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ; ২৭. এড. সাইদুর রহমান, প্রধান



নির্বাহী, মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন; ২৮. মো: আলমগীর কবির, সাধারণ সম্পাদক, বাপা; ২৯. সালেহ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন; ৩০. হিরণ মিত্র চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ৩১. শাহেদ কায়েস, কবি ও প্রাবন্ধিক; ৩২. মিঠুন রাকসাম, কবি, প্রকাশক ও আদিবাসী সংস্কৃতি কর্মী; ৩৩. এ্যড. প্রকাশ বিশ্বাস, আইনজীবী ও গল্পকার; ৩৪. সাঈদ আহমেদ, মানবাধিকার কর্মী; ৩৫. আবু আহমেদ ফয়জুল কবির, মানবাধিকারকর্মী; ৩৬. দীপায়ন খীসা, মানবাধিকার কর্মী; ৩৭. ড. হানা শামস আহমেদ, অধিকার কর্মী; ৩৮. মুক্তাশ্রী চাকমা, অধিকার কর্মী; ৩৯. বিজয় কেতন চাকমা, লেখক; ৪০. প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, অব: উপ সচিব; ৪১. শিশির চাকমা, কবি ও সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব; ৪২. ইন্দু লাল চাকমা, অব: মৎস্য কমকর্তা; ৪৩. নব কুমার চাকমা, সমাজকর্মী; ৪৪. প্রজ্ঞা জ্যোতি চাকমা, আদিবাসী অধিকার কর্মী; ৪৫. সিদ্ধেশ্বর চাকমা, আদিবাসী সমাজ কর্মী; ৪৬. প্রবৃত্তি কুমার চাকমা, অব: কর্মচারী ও সমাজ কর্মী; ৪৭. উক্রাচিং মারমা, নারী অধিকার কর্মী; ৪৮. ডা: মংউষা থোয়াই, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক ও লেখক; ৪৯. মংথুইপ্রু বাবুল, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক; ৫০. তনয়া ম্রো, কবি ও লেখক; ৫১. প্রসন্ন কুমার চাকমা, অব: প্রধান শিক্ষক ও লেখক; ৫২. মো: নুর খান, মানবাধিকার কর্মী।

বার্তা প্রেরক,

শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনসাধারণের স্মারকলিপি

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে বর্তমান সরকারের একের পর এক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন, আইন ও জনবিচ্ছিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ আয়োজন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান-

বরাবর
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
মাধ্যমে: জেলা প্রশাসক. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

তিন পার্বত্য জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

সবিনয় নিবেদন এই, আমরা সকলেই জানি অনেক ঘটনাবহুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পাহাড়ি-বাঙালি সকল পার্বত্যবাসী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে তাদের তিন পার্বত্য জেলার মনোনীত প্রার্থীদেরকে নিরংকুশ ভোটে নির্বাচিত করেন।

ফলশ্রুতিতে মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয়, যোগ্য, সৎ এবং দক্ষ সাংসদ ২৯৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনের বিজয়ী এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই সরকার পার্বত্যবাসীর নিকট অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু একাধারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শর্ত লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে একই মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণসহ দেশের অনেক রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও নানা মহল থেকে জোর আপত্তি ও অভিযোগ ছিল। ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া সরকারের এই সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি এই অভিযোগ তুলে বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অন্যত্র পদায়ন করার আহ্বান জানিয়ে দেশের ৩৫ বিশিষ্ট নাগরিক যৌথ বিবৃতি দিয়েছিল এবং একই অভিযোগ এবং জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অন্যত্র পদায়ন করার দাবি জানিয়ে ৬ জুন ২০২৬ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছিল।

প্রিয় মহোদয়, আপনার অজানা থাকার কথা নয় যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সাড়ে ৩ মাসের মাথায়



পদত্যাগ করেছিলেন। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংকট আরো ভিন্ন মাত্রা পেতে থাকে। দীপেন দেওয়ানের এই পদত্যাগ পার্বত্যবাসীর কেউ স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে তার পদত্যাগের দিন বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন এবং ব্যাকিরেড দিয়ে রাস্তা ব্লক করাসহ নানা পন্থায় ও উপায়ে প্রতিবাদ এবং দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়েছিল। এভাবে বেশ কয়েকবার এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ানকে স্ব-পদে পুনর্বহাল এবং জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অন্যত্র পদায়ন করার দাবি জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশ করে প্রতিবাদ মিছিল, মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। এইসব সভা-সমাবেশে এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ানকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের এই সমস্ত দাবি মেনে না নিয়ে এ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ানকে স্ব-পদে পুনর্বহাল না করে তাঁর পরিবর্তে বিগত ২৭/০৮/২০২৬ তারিখে জনাব সাচিং প্রু জেরীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু তাঁকে অন্যত্র (কক্সবাজার) দায়িত্ব অর্পণ করে প্রতিমন্ত্রী মীর হেলাল উদ্দিনকে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃংখলা, দুর্নীতি, ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্ত পার্বত্য এলাকার বিশেষ আইনের সাথে কোনভাবেই সঙ্গতিপূর্ণতো নয়-ই বরং তা করে জনগণের দাবির সাথে সরকারের যেন উল্টোযাত্রা করার সামিল হলো। তাছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোও পুনর্গঠন করা হয়েছে শতভাগ দলীয় এবং জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে যা গণতান্ত্রিক সমাজে কোনভাবে ও উপায়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বসাধারণের করা এতদিনকার কোন দাবির কথা একটি বারের জন্যও পরিপূরণ করার বিবেচনায় এনেছে বলে মনে হয়না, বরং জনবিচ্ছিন্ন ও স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে এই কথা সরকার নিজেই একের পর এক কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। যেমন অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের উপযুক্ত প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কোন প্রকার পূর্ব আলাপ ও তাদের সম্মতি ব্যতীত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল স্পিরিটকে পদদলিত করে বিগত ১০/০৯/২০২৬ তারিখে একতরফাভাবে সরকার ১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি এই তিনটি কমিটি গঠন করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করার এক অশুভ অবতারণা করছে বলে আমরা দেখতে পাই। এমনকি এই সমস্ত কমিটিতে পার্বত্য এলাকার যথাযথ ও উপযুক্ত প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত মাত্রায় সম্পৃক্ততা ও কার্যপরিধি যুক্ত থাকায় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, জাতীয় কমিটিসহ তিনটি কমিটির কার্যপরিধি নির্দেশ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Allocation of Businesং অনুসারে বিদ্যমান আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংবলিত যে বিশেষ শাসনব্যবস্থা রয়েছে তার সাথে ১০/০৯/২০২৬ তারিখে গঠিত তিনটি কমিটির কার্য, অধিক্রমন ও সাংঘর্ষিক হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা পূর্বেকার যে কোন সময়ের চেয়ে আরও কঠিন হয়ে পড়বে বলে সচেতন মহলের নিকট আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রিয় মহোদয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করা হয়। আমরা মনে করি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। তাই সরকারের উপরোল্লিখিত সকল জনবিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রত্যাহার ও পুনর্মূল্যায়ন করা প্রযোজন। তাই আমাদের দাবি হলো—

১। জনাব মীর হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সরিয়ে অন্যত্র পদায়ন করা এবং চুক্তি লংঘন না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কোন প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী নিয়োগ না দেওয়া।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব হেলাল উদ্দিনকে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃংখলা, দুর্নীতি, ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং



জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের বৈধ ও উপযুক্ত প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করে গঠিত তিনটি কমিটি: ১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি সমূহের কার্যক্রম বাতিলকরণসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তিনটি কমিটি: ১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি; ও ৩. ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স পূনর্গঠন করা।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার রোডম্যাপ ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বিনীত
পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের পক্ষে
৯২ জনের স্বাক্ষর

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের বিবৃতি

সম্প্রতি পার্বত্য চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ৩টি আলাদা কমিটি গঠন করার প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশ আয়োজনে: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আপনারা সকলে নিশ্চয় অবগত আছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। স্বাধীনতার পর পাহাড়ের জুম্ম জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র সামরিকায়নের মাধ্যমে দমন পীড়নের পথ বেছে নেয়। এ প্রক্রিয়ায় অধিকারহীন করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল বহুদিন ধরে। ফলে আমরা দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সশস্ত্র সংঘাত দেখেছি। সেই সংঘাতে সামরিক-বেসামরিক বহু মানুষ হতাহত হয়েছে এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছে বহু নিরীহ পাহাড়ী জনগণ। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারসহ বিভিন্ন সরকারের সাথে ধারাবাহিক ২৬ বার বৈঠকের মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেলেও সেটি স্বাক্ষরের ২৯ বছর পর চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে পাহাড়ের সমস্যার কার্যত কোনো সমাধান এখনো হয়নি।

সংগ্রামী জনতা,

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান বিএনপি সরকার আবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বিএনপি সরকার বহুত্ববাদী একটি রাষ্ট্র গঠনে অগ্রসর হবে এটাই আপামর জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিন পার্বত্য জেলার জনসাধারণ পার্বত্য তিনটি আসনে বিএনপিকে বিপুল ভোটে তাদের প্রার্থীকে জয়ী করে। একইসাথে পাহাড়ের জনগণ ও দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান কল্পে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় হবে। সেই আশাবাদ আরো জোরদার হয়, যখন আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে এই সরকার তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে 'রেইনবো নেশন' গড়ার লক্ষ্যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তা বাস্তবায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি অনুযায়ী যেভাবে গঠন করে পরিচালনা করবার কথা ছিল সেভাবে করা হচ্ছে না। বিশেষ করে চুক্তিকে লংঘন করে মন্ত্রণালয়ে অ-পাহাড়ী প্রতিমন্ত্রী নিযুক্তিতে পাহাড়ের জনসাধারণ প্রতিবাদ জানালেও তাকে এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। বরং সামরিক কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলমান রাখা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, স্বরাষ্ট্রসচিবকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে পার্বত্য



চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিসমূহের মধ্যে উপরোক্ত দু'টি কমিটিকে সচিবালয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) কর্তৃক প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

গঠিত কমিটিসমূহের কার্যপরিধির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পরামর্শক কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটিকে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। এই সুপারিশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নির্বাহী কমিটি আগামী তিন মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশলের খসড়া প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিকে দেবে। এরপর জাতীয় কমিটি সেই কর্মকৌশল চূড়ান্ত করবে। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র সচিব এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রচলিত আইন, চুক্তির শর্ত ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এবং নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ণে সুপারিশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

আমরা পরিলক্ষিত করছি যে, বর্তমান সরকারও আশির দশকের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে নিরাপত্তার চশমা দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদারে আমরা গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছি।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অতীতের সরকারসমূহ সামরিক ও বেসামরিক আমলা কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলকে শাসন করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন না হয়ে বরং সংঘাত, রক্তপাত, বিভেদ এবং বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংঘাত ও বিভেদ থেকে সরে এসে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র বিক্ষুব্ধ পাহাড়ি জনগণের সাথে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০২৬ সালে এসেও সামরিক ও বেসামরিক আমলা কর্তৃত্বের প্রেসক্রিপশনে পার্বত্য অঞ্চল শাসন করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা উল্টো পথে যাত্রারই সামিল ।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে রাজনৈতিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধানের আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করছি—

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তিনটি কমিটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে;

২. পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ-পাহাড়ী প্রতিমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যাহার করতে হবে;

৪. চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ও কার্যকর করতে হবে;

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে;

৬. বিধিমালা প্রণয়ণসহ দ্রুততম সময়ে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করতে হবে;

৭. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সংলাপ আয়োজন করতে হবে;

৮. পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যাসহ সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে বহুপক্ষীয় অর্থবহ সংলাপ শুরু করতে হবে।

বি:দ্রঃ ৫ অক্টোবর ২০২৬, সোমবার, বিকাল ৩:৩০, শাহবাগ, জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন কর্তৃক প্রচারিত।

(চ) রাজধানীতে ছাত্র-যুব সংগঠনগুলোর গণসংযোগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক তিনটি পৃথক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বাতিল এবং অবিলম্বে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে রাজধানীতে গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ।

গত ১৩ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল সাড়ে ৪ টায় রাজধানীর পুরান পল্টন মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির সূচনা হয়। পরবর্তীতে পল্টন মোড় থেকে বিজয়নগর হয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্মীরা পথচারী ও



সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সদস্য দীপক শীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান প্রধান ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের দীর্ঘ ২৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। উল্টো আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রেখে সমস্যার সমাধানকে আরও জটিল করে তোলা হচ্ছে।

সমাবেশে বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের প্রত্যাশা থাকলেও সরকার রাজনৈতিক সমাধানের পথ ছেড়ে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করছে। চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অ-পাহাড়ি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা পাহাড়ি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পরিপন্থী।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী শান্তির জন্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। চুক্তি পরিপন্থী সব ধরনের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

কর্মসূচিতে বিতরণ করা প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়, গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি', স্বরাষ্ট্রসচিবকে প্রধান করে 'নির্বাহী কমিটি' এবং পরিবীক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যানকে প্রধান করে 'পরামর্শক কমিটি'–এই ৩টি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংগঠনগুলোর দাবি, এসব কমিটিকে সাচিবিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরকে (ডিজিএফআই) দেওয়া হয়েছে, যা মূল চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন। অতীতে সামরিক ও বেসামরিক আমলা দিয়ে শাসন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে প্রচারপত্রে বলা হয়, ২০২৬ সালে এসে আবারও একই প্রেসক্রিপশনে পাহাড়ে শাসন চালানোর চেষ্টা উল্টো পথে যাত্রার শামিল।

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ও রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ৮টি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হয়:

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তিনটি কমিটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

২। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ-পাহাড়ী প্রতিমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ও কার্যকর করতে হবে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬। বিধিমালা প্রণয়ণসহ দ্রুততম সময়ে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করতে হবে।

৭। অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সংলাপ আয়োজন করতে হবে।

৮। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যাসহ সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে বহুপক্ষীয় অর্থবহ সংলাপ শুরু করতে হবে।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চংগা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ)-এর সভাপতি গৌতম শীল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন।

> 'পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।'
>
> *–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*



সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

বাঘাইছড়ির সাজেকে বিজিবির ডাম্পার গাড়ির ধাক্কায় গর্ভবতী শিক্ষিকা নিহত



রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে বিজিবির ডাম্পার গাড়ির ধাক্কায় সুমন্তী চাকমা (৩০) নামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক গর্ভবতী শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। ভুক্তভোগী সুমন্তী চাকমার স্বামী স্বপন চাকমা (৩২), বাড়ি সাজেকের ডাব আদাম গ্রামে। তিনি ডাব আদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ জুলাই ২০২৬, শনিবার সকাল আনুমানিক ১১:৩০ টার দিকে সাজেক ইউনিয়নের মাচালং ১৪ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুমন্তী চাকমা তাঁর গ্রামের স্থানীয় সিএনজি চালক হরেন্দ্র ত্রিপুরার সঙ্গে সন্তান প্রসবের জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নন্দারাম ও এগোজ্যাছড়ি গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি বিজিবির ডাম্পার গাড়ি তাঁদের বহনকারী সিএনজিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিটি দুর্ঘটনার শিকার হলে ঘটনাস্থলেই সুমন্তী চাকমার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় সিএনজি চালক হরেন্দ্র ত্রিপুরাও গুরুতর আহত হয়েছেন।

লংগদুতে এক জুম্ম যুবককে জোরপূর্বক ধরে ‘জেএসএসের কালেক্টর’ তকমা দিয়ে আটক



রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বগাচতর ইউনিয়ন এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের একটি দল এক জুম্ম যুবককে ধরে ‘জেএসএস’র কালেক্টর’ তকমা দিয়ে এবং একটি পুরনো দেশি বন্দুক গুঁজে দিয়ে আটক ও মারধর করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর নিকট সোপর্দ করেছে। ওই যুবকের নাম সুকেন চাকমা (২৫), বাড়ি লংগদুর সীমান্তবর্তী বাঘাইছড়ি এলাকায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই ২০২৬ সকাল আনুমানিক ১০:৪০ টার দিকে মো: খলিল, সাইফুল ও নুরনবীর নেতৃত্বে বশর, ওসমান, আলআমিন সহ স্থানীয় সেটেলার বাঙালিদের ২২/২৫ জনের একটি দল বগাচতর ইউনিয়নের চিবেরেগা গ্রামের চিবেরেগা দোকানে গিয়ে কালেক্টর খুঁজতে থাকে।

এসময় ঐ দোকানের পাশে গ্রামের স্থানীয় ২/৩ জন গ্রামবাসী এবং আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসা সুকেন চাকমা তার বন্ধুদের সাথে আমগাছের নীচে বসে গল্প করছিল। এক পর্যায়ে সেটেলাররা সুকেন চাকমাকে অপরিচিত হিসেবে তাকে “কালেক্টর” তকমা দিয়ে সেখান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

প্রায় ৩ ঘন্টা যাবৎ সেটেলার বাঙালিরা সুকেন চাকমাকে তাদের হেফাজতে রেখে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের পর একটি পুরনো দেশীয় বন্দুক গুঁজে দিয়ে এবং ‘জেএসএস’র কালেক্টর’ তকমা দিয়ে স্থানীয় ৩৭ বিজিবির রাজনগর জোন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। জানা যায়, সেই দেশীয় বন্দুকটির মালিক চিবেরেগা এলাকার সেটেলার “মো: বশর” হাতি তাড়ানোর নামে নিয়মিত ব্যবহার করত এবং সেটা দেখিয়ে এলাকায় অন্যকেও প্রায় সময় হুমকি প্রদান করত।



বাঘাইছড়িতে বিজিবি সদস্য কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মীয়গুরু হেনস্তার শিকার

গত ২৮ জুলাই ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে কোজোইছড়ি বিজিবি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যদের কর্তৃক সত্যমতি ভান্তে নামে এক বৌদ্ধ ধর্মীয়গুরু হেনস্তার শিকার হয়েছেন। হেনস্তার শিকার সত্যমতি ভিক্ষু বাঘাইছড়ির অজলচুগ বৌদ্ধ বিহারের বিহার অধ্যক্ষ বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৮ জুলাই সকাল ৭:০০ টার দিকে মাঝিপাড়া সীমান্ত সড়কের ৮ কিলো জায়গার স্থানীয় অধিবাসী বিনয় চাকমার নিমন্ত্রণে সত্যমতি ভান্তে তাঁর ৫ জন ভিক্ষুসংঘ সহ পিন্ডাচরণে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের কোজোইছড়ি বিজিবি ক্যাম্পের সামনে পৌঁছালে সেখানে চেকপোস্টে ডিউটিরত জনৈক এক বিজিবি ও আনসার সদস্য ভান্তেদের গাড়ি আটকে দেয় এবং ভান্তেদের হয়রানিমূলক নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ভান্তে সবকিছুর ঠিক ঠিক উত্তর দিলেও তারা কিছুতেই তাঁদের সেখান থেকে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

এভাবে প্রায় দেড়-দুই ঘন্টা তাঁদের গাড়ি থেকে নামিয়ে পথে দাঁড় করিয়ে রাখার এক পর্যায়ে সত্যমতি ভান্তে বলেন, তিনি তাদের উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে চান। এতেও বিজিবি ও আনসার সদস্যরা অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে ভান্তের জোরাজুরিতে কোজোইছড়ি বিজিবি ক্যাম্প থেকে একজন বিজিবি কর্মকর্তা (সুবেদার হতে পারেন) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ভান্তে তার কাছে বিস্তারিত খুলে বলেন। ভান্তের সাথে কথা বলার পর উক্ত বিজিবি কর্মকর্তা ভান্তেদের যাওয়ার অনুমতি দেন।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিনজনের বাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ভাঙামুড়া গ্রামে তিনজনের বাড়িতে সেনাবাহিনীর একটি দল ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করে। গত ৩০ জুলাই ২০২৬ দুপুর আনুমানিক ২:০০ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাঙামুড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত শান্তি কুমার চাকমার ছেলে– জীবন চাকমা (৪২), জুনেন চাকমা (৩৭) ও সোহাগ বসু চাকমা (৩৬) নামে তিনজনের বাড়ি তল্লাশি করে বুড়িঘাট সাব-জোনের একদল সেনাবাহিনীর সদস্য।

সেনা সদস্যরা সন্ত্রাসী খোঁজার নামে বাড়িতে প্রবেশ করে ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং বাড়ির আসবাবপত্র ও জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তল্লাশির পর কোনো প্রকার অবৈধ জিনিস পাওয়া যায়নি। যাওয়ার পূর্বে সেনা সদস্যরা স্মার্টফোন দিয়ে বাড়ির ভিডিও চিত্র ধারণ করে সেখান থেকে চলে যায়।

থানচির বলীপাড়ায় সেনাবাহিনীর মারধরের শিকার ৪ জুম্ম গ্রামবাসী

গত ১০ আগস্ট ২০২৬ বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার বলীপাড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের জনিরাম পাড়া (বটগাছপাড়া) গ্রামের এক কিশোরসহ ৪ নিরীহ গ্রামবাসী সেনাবাহিনীর মারধরের শিকার হয়েছেন। বান্দরবানের আলীকদম সেনা জোনের সেনাদলের সদস্যরা উক্ত গ্রামবাসীদের হয়রানিমূলক প্রশ্ন করে বিনা অপরাধে অমানবিকভাবে মারধর করে।

মারধরের শিকার গ্রামবাসীরা হলেন– ১. সলোমন ত্রিপুরা (১৮), পীং-মানিঙ্গ ত্রিপুরা; ২. জীবন ত্রিপুরা (১৫), পীং-মানিঙ্গ ত্রিপুরা; ৩. জগদীশ ত্রিপুরা (২১), পীং-নথিচন্দ্র ত্রিপুরা ও ৪. ইলিসাই ত্রিপুরা (২৮), পীং-মৃত আইরা ত্রিপুরা। প্রহৃতদের মধ্যে জীবন ত্রিপুরা গুরুতর আহত হয়েছেন এবং গ্রামবাসীরা তাকে চিকিৎসার জন্য ১১ আগস্ট অন্যত্র নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট থেকে আলীকদম সেনা জোন থেকে জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি বড় সেনাদল থানচির বলীপাড়া ইউনিয়নের ক্যাচুপাড়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং আশেপাশের এলাকায় টহল অভিযান শুরু করে। উক্ত সেনাদল হতে ২০ জনের একটি সেনাদল গতকাল বলীপাড়া ইউনিয়নের জনিরাম পাড়া (বটগাছ পাড়া) গ্রামে যায়।

উক্ত সেনাদলটির সদস্যরা উক্ত চার গ্রামবাসীকে তাদের এলাকায় 'শান্তিবাহিনী আসে কিনা, এখানে থাকে কিনা ইত্যাদি' নানা হয়রানিমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এক পর্যায়ে বেদম মারধর করে।

এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা গ্রামে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশিয় বন্দুকের বাটের একটি খণ্ড খুঁজে পায়। এরপর সেনাসদস্যরা গ্রামবাসীদের বন্দুক থাকলে দিতে বললে, গ্রামবাসীরা বন্যশূকর শিকারের জন্য ব্যবহৃত দুটি দেশীয় 'গাদা বন্দুক' সেনাবাহিনীর হাতে দেয়। সেনা সদস্যরা সেই বন্দুকগুলো দেখার পর আবার গ্রামবাসীদের ফেরত দেয়।



বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর বসতঘর ভাঙার নির্দেশ, পর্যটন ব্যবসার পাঁয়তারা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নের তুমপাড়া গ্রামে এক জুম্ম গ্রামবাসীর বসতঘর ভেঙে ফেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ও গাছবাগান গ্রামে কোনো বাড়ি নির্মাণ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে। সেনাবাহিনী ঐসব এলাকা থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ করে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের পাঁয়তারা করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের তুমপাড়া গ্রামে একটি বসতঘর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে ২৬ ইসিবি সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর দেওয়া এক নোটিশে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে বাড়িটি ভেঙে ফেলার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পূর্বে সড়ক নির্মাণকালে ধসে যাওয়া রাস্তা ভরাটের জন্য ২৬ ইসিবি-র তৎকালীন ওয়ারেন্ট অফিসার রঞ্জন চাকমা পাহাড়িদের জায়গা থেকে মাটি কাটার অনুমতি চান। পরবর্তীতে সেখানে বাড়িঘর নির্মাণ করা যাবে, এমন শর্তে এলাকাবাসী মাটি কাটতে দেন। মাটি কাটার পর সমতল হওয়া জায়গায় পর্যটকদের জন্য কয়েকটি বেঞ্চ বসিয়ে সেনাবাহিনী পরবর্তীতে বাড়ি তৈরির বিষয়ে সম্মতি জানালেও, বর্তমানে ২৬ ইসিবি-র ক্যাপ্টেন ইকবাল উক্ত স্থানকে 'জিরো পয়েন্ট' দাবি করে বসতবাড়ি নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি নির্মিত বাড়িটির মালিককে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজ দায়িত্বে বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পাঁয়তারা হিসেবেই সেনাবাহিনী তুমপাড়ার উক্ত জায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের দাবি, স্থানীয় জুম্ম জনগণকে নিজ ভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

এদিকে একই উপজেলার গাছবাগান এলাকাতেও বসতবাড়ি নির্মাণ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার, ২৬ ইসিবির ক্যাপ্টেন ইকবালের নির্দেশে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার আয়ুব ও ওয়ারেন্ট অফিসার সুবেদার নাছিরের উপস্থিতিতে উক্ত এলাকার ১১ জন হেডম্যান, কারবারি, জুরাছড়ির ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বার এবং ফারুয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বারকে ক্যাম্পে ডেকে একটি সভা করা হয়। সভায় ক্যাপ্টেন ইকবাল গাছবাগান গ্রামের রাস্তা থেকে ৫০ হাতের মধ্যে কোনো নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করা যাবে না এবং ওই সীমার মধ্যে বাড়ি নির্মাণ করা হলে সেনাবাহিনী তা ভেঙে দেবে বলে জানান। সেনাবাহিনীর এমন নির্দেশে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

গাছবাগান গ্রামের বাসিন্দারা জানান, সেনাবাহিনী নির্দেশ দিয়েছে, পুরনো বাড়িগুলো ভাঙলে মেরামত করা যাবে না এবং কোনো নতুন বসতিও স্থাপন করা যাবে না। ওই এলাকায় কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠী না থাকা সত্ত্বেও সেখানে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাছবাগান এলাকাটিও ভবিষ্যতে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে। এ কারণে ধীরে ধীরে স্থানীয় জুম্ম জনগণের বসতবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করে তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে তারা আশঙ্কা করছেন।

স্থানীয়দের মতে, এটি পাহাড়ি জুম্মদের তাদের নিজস্ব বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে জায়গা দখলের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। নিজেদের জায়গা হারানোর ভয়ে বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় জুম্মরা।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এলাকার কার্বারি, হেডম্যান ও মেম্বারদের ডেকে গালিগালাজ করার অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ২৯ বীর দীঘলছড়ি জোনের অধীন ফারুয়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তাংখুইতাং সেনা ক্যাম্পের সুবেদার মো: ইয়াকুব কর্তৃক গত ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ২ ঘটিকায় বড়থলি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড এবং ফারুয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের কার্বারি, হেডম্যান ও মেম্বারদের ডেকে গালাগালিজ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই সময় মিটিংয়াছড়ি গ্রাম, বৈরাক্যাছড়া গ্রাম, রায়মনছড়া গ্রাম, শীলছড়ি গ্রাম এবং সারাল্যাছড়া গ্রাম থেকে মেম্বার, কার্বারি এবং হেডম্যানসহ মোট ১৬ জন গ্রামের মুরুব্বিকে উক্ত ক্যাম্পে ডাকা হয়।

স্থানীয় সূত্র মোতাবেক, উক্ত সেনা ক্যাম্পের সুবেদার মো: ইয়াকুব এবং তার সহকারী মিলে এক আলোচনার জন্য উক্ত গ্রামের ১৬ জন মুরুব্বিকে ক্যাম্পে ডাকা হয়। এই সময়



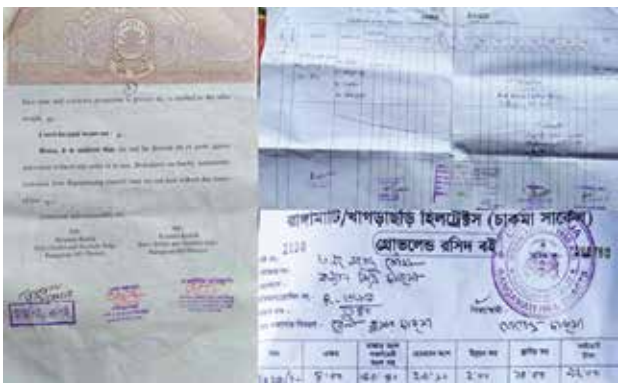
ক্যাম্পের সুবেদার আলোচনার অজুহাতে গ্রামবাসীদের বলতে থাকে, 'আপনাদের কাছে আমরা কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছি না। আমরা কোনো কাজে ডাকলেও আপনারা সেনা ক্যাম্পে আসেন না এবং আমাদের দৈনন্দিন বাজার আনার জন্য যে শ্রমিক দরকার হয় এতেও আমরা আপনাদেরকে পাই না।' এমন অবস্থা হলে আপনাদের বিরুদ্ধে কঠোর বিধি বিধান আরোপ করতে বাধ্য হব' বলে জানিয়ে দেন তিনি।

ক্যাম্পের সুবেদার রাগান্বিত স্বরে আরো বলেন, শান্তিবাহিনী বা জেএসএস এবং কুকি-চিন এর সশস্ত্র সদস্যরা কোথায় অবস্থান করছে কোন গ্রামে অবস্থান করে তাদের জানাতে হবে।

ক্যাম্প সুবেদার আরো বলেন, ভবিষ্যতে সেনা ক্যাম্প থেকে খবর দেওয়ার সাথে সাথে যেন আপনারা উপস্থিত হন। সেনা ক্যাম্পে যদি খবর দেওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত না হন তাহলে আপনাদের এবং এলাকাবাসীর জন্য কঠোর বিধিবিধান আরোপ করা হবে।

ক্যাম্পের সুবেদার আরও জানান, আমরা কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরতে আসবো। এই সময় আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। কয়েকদিন পর আমাদের জোন কমান্ডার সাহেব তাংখুইতাং সেনা ক্যাম্পে আসবেন। তখন যদি প্রয়োজন হয় আপনাদেরকে ক্যাম্পে ডাকা হবে।

লংগদুতে সেনা কমান্ডার কর্তৃক ভূমি বেদখলকারীর পক্ষে অন্যায় সুপারিশ, ভূমির মালিককে হুমকি



রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ৭নং লংগদু ইউনিয়নে ভূমি বিরোধ নিয়ে আলোচনা করার নামে সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা এক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালির পক্ষে অন্যায় সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি ওই সেনা কর্মকর্তা ভূমির প্রকৃত মালিক জুম্ম গ্রামবাসীকে নানা হুমকি দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৩টার দিকে হেলিকপ্টার যোগে বড় কমান্ডার আসবেন বলে বামে লংগদু সেনা সাব-জোনের কমান্ডার মেজর ইমরুল কর্তৃক স্থানীয় গ্রামের কার্বারি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাব-জোনে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া গত ২০ সেপ্টেম্বর লংগদু ইউনিয়নের ভাইবোনছড়া এলাকায় দুই সেটেলার বাঙালি কর্তৃক রেলি কুমার চাকমা নামে এক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের কথা বলে ভূমির মালিক জুম্ম ও সেটেলার বাঙালিদেরও সেখানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়।

কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক গ্রামের কার্বারি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং ভূমি সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট জুম্ম ও সেটেলার বাঙালিরা সেনা সাব-জোনে যথাসময়ে উপস্থিত হলেও সেখানে কোনো উর্ধতন সেনা কর্মকর্তা আসেননি। এসময় সাব-জোনের কমান্ডার মেজর ইমরুল নিজেই উপস্থিত সকলকে নিয়ে ভূমি নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা বিষয়ে আলোচনায় বসেন।

এসময় সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক রেলি কুমার চাকমার পক্ষে তার আপন ভাগ্নে এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী সুগতি চাকমা যিনি দীর্ঘ বছর ধরে বসতবাড়ি ও বাগান-বাগিচাসহ ভোগ-দখলে রেখে জায়গাটি রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন, তিনি তার মালিকানার পক্ষে দলিল ও প্রমাণ সহ বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেন।

অপরপক্ষে উক্ত ভূমি অবৈধভাবে জবর-দখলের চেষ্টাকারী সেটেলার মো: ছাত্তার তার সকল অভিযোগ অস্বীকার করে কোনো প্রকার প্রমাণপত্র ব্যতীত জায়গাটি তার বলেই দাবি করেন।

এসময় কমান্ডার মেজর ইমরুল উপস্থিত সকলের সম্মুখে জায়গাটি উভয়পক্ষকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া অথবা সেটেলার মো: ছাত্তারকে বসতবাড়ি নির্মাণ করার জন্য কিছু পরিমাণ জায়গা ভাগ দেওয়ার অন্যায় প্রস্তাব করেন। ভূমি বেদখলের চেষ্টাকারী সেটেলার ছাত্তারের পক্ষে মেজর ইমরুলের এহেন অদ্ভুত ও অন্যায় সুপারিশ শুনে উপস্থিত সকলেই অবাক হন। এসময় মেজর ইমরুল জায়গার মালিক রাজি না হলে, ৫/৬ দিনের মধ্যে বোঝাপারা না হলে বসতবাড়ি ভেঙ্গে জায়গা ছেড়ে সুগতি চাকমাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তা না হলে সুগতি চাকমাকে তিনি দেখে নেবেন বলেও হুমকি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সেটেলার বাঙালিরা যখন ভূমি বেদখলের চেষ্টা করছিল তখন সেই দৃশ্যের ছবি ও ভিডিও সমির কুমার চাকমা নামের এক গ্রামবাসীর ছেলে মোবাইলে ধারণ করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে, সেটেলার বাঙালিদের



দাবিতে মেজর ইমরুল উক্ত ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলতে বাধ্য করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২:৩০ ঘটিকার সময়ে লংগদু ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ভাইবোনছড়া এলাকায় জুম্মদের জায়গায় ঢুকে ২ জন সেটেলার বাঙালি এক জুম্মর জায়গা বেখদল করার চেষ্টা করে। অভিযুক্ত সেটেলার বাঙালিরা হলো– মো: ছাত্তার (৪৩), পিতা: মো জসিম উদ্দিন ও ২) মো: জয়নাল (৬০), পিতা- অজ্ঞাত। তাদের উভয়ের বাড়ি আনোয়ার টিলা নামক এলাকায় বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সেটেলার মো: ছাত্তার ও মো: জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একদল সেটেলার বাঙালি রেলি কুমার চাকমার ভূমি জবর-দখল করার প্রচেষ্ঠা চালিয়েছিল। সে সময়ে জায়গার মালিক রেলি কুমার চাকমা তাদের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটিতে যুগ্ম ও জেলা দায়রা জজ আদালতে একটি সিভিল মামলা দায়ের করেন, যার মামলা নং- ৩৬৪/২০১৮। আদালত পরে আদেশ নং- ২৩, তারিখ- ০৩/১১/২০২৪ মূলে রেলি কুমার চাকমার পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং উক্ত রায়ের কপি ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে সংগ্রহ করে লংগদু উপজেলা প্রশাসনকেও অবগত করা হয়। তৎসময়ে লংগদু জোন কমান্ডার এবং উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্দ্যোগে এবং আদালতের আদেশে উক্ত সমস্যার সমাধান করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি আবার নতুন করে মো: সাত্তারের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা ওই জায়গাটি বেদখলের পাঁয়তারা শুরু করেছে।

বিলাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক তকমা দিয়ে ২ জুম্মকে বেধড়ক মারধর, লাঠিচার্জে আহত অন্তত ১২



গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৫ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া ইউনিয়নের গাছবাগান পাড়া এলাকায় বিজিবির কাপ্তাই ব্যাটালিয়ন (৪১ বিজিবি)-এর অধীনস্ত দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে দুই জুম্ম গ্রামবাসীকে ভারতীয় নাগরিক তকমা দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উক্ত মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন: ১) মনচিক্কা তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), পিতা-ধন মনি তঞ্চঙ্গ্যা ২) সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা (৩২), পিতা: পারোবাত তঞ্চঙ্গ্যা। তারা উভয়ে ভাসন্যা (ভাসমান) কাপড় ব্যবসায়ী বলে জানা যায়।

অপরদিকে, বিজিবির মারধরের হাত থেকে ওই দুই ব্যক্তিকে বাঁচাতে স্থানীয় নর-নারী গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানালে, বিজিবি সদস্যরা গ্রামবাসীদের লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং নারীদেরকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।

বিজিবি কর্তৃক লাঠি চার্জ ও শ্লীলতাহানির চেষ্টার শিকার ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নরূপ: ১) ফলোদেবী তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), স্বামী- গোলাকো তঞ্চঙ্গ্যা; ২) ঝরবি চাকমা (৩৪), স্বামী-তুদো চাকমা; ৩) মিলেবো চাকমা (৩১), স্বামী- সবক্কে চাকমা; ৪) সিদেবি চাকমা (৩২), স্বামী-কানি রঞ্জন চাকমা; ৫) কালেন্দি চাকমা (৩২), স্বামী- বদাহেয়ে চাকমা; ৬) সিলেস চাকমা (৩৬), স্বামী- হিরাময় চাকমা; ৭) স্বর্ণরানি চাকমা(৩৩), স্বামী-দুদহেয়ে চাকমা; ৮) বিকা চাকমা (৩৫), স্বামী-গৌতম চাকমা; ৯) বিরোজ প্রতি চাকমা (৩৬), স্বামী-নিক্ত লাল চাকমা; ১০) জোনিকা তঞ্চঙ্গ্যা, (৩৪), স্বামী- নতুনজয় তঞ্চঙ্গ্যা; ১১) বনকান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (৩৪), পিতা-রাডোং তঞ্চঙ্গ্যা; এবং ১২) পরগধন চাকমা (৩৬), পিতা- দিন্নমহন চাকমা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন বিকাল ৪ ঘটিকার সময় উক্ত ভুক্তভোগী স্থানীয় দুই কাপড় ব্যবসায়ী নিজেদের মালপত্র নিয়ে বগাখালি বাজার ও আদেবাপছড়া বাজারের উদ্দেশে রওনা দেন। পরে দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য তাদের আটক করে। এই সময় তাদের উপর তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় তাদের মালপত্রে অবৈধ বা ভারতীয় কোনো পণ্য বিজিবি সদস্যরা সন্ধান পাননি। কিন্তু তবুও বিকাল ৫ ঘটিকার সময়ে বিজিবি সদস্যরা উক্ত দুই জুম্মকে ভারতীয় নাগরিক তকমা দিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

পরে উক্ত দুই জুম্মকে আটক করে রাজস্থলী থানায় নেওয়ার পথে দুলুবাগান পাড়া নামক গ্রামে পৌঁছলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিজিবির গাড়ি গতিরোধ করে। এই সময় এলাকাবাসীরা বিজিবির দায়িত্বরত ওয়ারেন্ট অফিসারকে তাদেরকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রশ্ন করলে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা তাদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে এবং গ্রামবাসীদের গুলি করার হমকি প্রদান করে। সেখানে বিজিবি সদস্যদের কর্তৃক অসদুদ্দেশ্যে নারীদের বিভিন্ন স্পর্শকাতর



স্থানে হাত দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসময় অন্তত ১২ জন জুম্ম নারী ও পুরুষ মারধর ও শ্লীলতাহানির শিকার হয়।

দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্পে কার্বারি-মেম্বারদের তলব: ৩ গ্রামের প্রতিটি পরিবারের বায়োডাটা জমা দেওয়ার নির্দেশ

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই ওয়াগ্‌গা জোন (৪১ বিজিবি)-এর অধীনস্থ বিলাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ দুমদুমিয়া এলাকার স্থানীয় জুম্ম জনপ্রতিনিধি, কার্বারি ও হেডম্যানদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে তিন গ্রামের প্রতিটি পরিবারের বায়োডাটা তাদেরকে জমাদানের নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিজিবির এমন নির্দেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জুম্মদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্পে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৪১ বিজিবির কাপ্তাই ওয়াগ্‌গা জোন কমান্ডার (সিও) লে. কর্নেল মেহেদি হাসান কায়সার, সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা ও দুমদুমিয়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার লিয়াকত আলী। অপরদিকে জোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হন গাছ বাগান পাড়া ও চাইচল পাড়ার হেডম্যান বলভদ্র চাকমা, ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার সিদ্ধার্থ চাকমা, দুলু বাগানের কার্বারি অজিত কুমার চাকমা, কাঞ্চন কুমার চাকমা এবং কাজল চাকমাসহ এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বৈঠকে ওয়াগ্‌গা জোনের সিও উপস্থিত মুরুব্বিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সাথে এতদিন বিজিবির সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। কিন্তু দু'জন ভারতীয় নাগরিকের জন্য বিজিবির সাথে মারামারি করা উচিত হয়নি। এটার একটা সঠিক বিচার হতে হবে। তবে উপস্থিত হেডম্যান, মেম্বার ও কার্বারিরা বিজিবি অধিনায়কের এই বক্তব্যের জবাবে কোনো মন্তব্য না করে চুপচাপ তা শুনে চলে আসেন বলে জানা গেছে ।

ঘটনার পরদিন গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকালে জোন কমান্ডার ও ব্রিগেড কমান্ডার এলাকা ত্যাগ করার পর, সকাল ৮টার দিকে ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার লিয়াকত আলী দুলু বাগান গ্রামের অজিত কুমার কার্বারিকে পুনরায় ক্যাম্পে ডেকে পাঠান। ক্যাম্প কমান্ডার অজিত কুমার কার্বারিকে নির্দেশ দেন যে, আজকের মধ্যে চাইচল, গাছ বাগান ও দুলু বাগান এই তিন গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং তাদের বায়োডাটা জমা দিতে হবে।

একই সাথে আগামী দুই দিনের মধ্যে উক্ত তিন গ্রামের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল বাসিন্দাদের নিয়ে একটি বিশেষ মিটিং আয়োজনের নির্দেশ দেন ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার লিয়াকত আলী। ঐ মিটিংয়ে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে উপস্থিত থাকার জন্য বাধ্যতামূলক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ক্যাম্প থেকে আরও জানানো হয়, আজ বিজিবির অতিরিক্ত ৫০ জন সদস্য দুমদুমিয়া ক্যাম্পে এসে যোগ দেবেন।

এসব ঘটনার পর থেকে সংশ্লিষ্ট তিন গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে পুরো গ্রামের বাসিন্দাদের বায়োডাটা তলব এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের আশঙ্কায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে।

সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসী কর্তৃক দীঘিনালায় এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসী কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়ন এলাকা পঞ্চাশোর্ধ বয়সী এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়েছেন।

অপহৃত ব্যক্তির নাম প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা (৫২), পীং-হিরালাল চাকমা এবং বাড়ি বাবুছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে রোক চন্দ্র মহাজন পাড়ায়। তার কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা নেই বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ২৪ জুলাই ২০২৬ ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় চাঁদা সংগ্রাহক নয়ন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (প্রসিত)-এর একটি সশস্ত্র দল প্রকৃতি রঞ্জন চাকমাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ফেরদৌস চাকমাকে নিয়ে ইউপিডিএফের ভূয়া অপহরণ নাটক

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ছোট কমলাক এলাকার বাসিন্দা ফেরদৌস চাকমাকে সাজেক পর্যটনকেন্দ্রের 'সেম প্লেস রেস্টুরেন্ট' থেকে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক অপহরণ করা হয়েছিল বলে ইউপিডিএফ যে অপপ্রচার



চালায় তা শেষ পর্যন্ত ভূয়া ও সাজানো নাটক বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এরপর কয়েকদিন যাবৎ ইউপিডিএফ সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন পেইজ থেকে যে ব্যক্তিকে পিসিজেএসএস অপহরণ করেছে বলে ব্যাপক মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচার চালায় শেষ পর্যন্ত সেই ফেরদৌস চাকমা নিজ বাড়িতে রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় ও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে সাজেকে কোনো অপহরণের ঘটনাই ঘটেনি। ইউপিডিএফের দাবি অনুযায়ী, গত ৩ আগস্ট ২০২৬, সোমবার সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে সাজেকের "সেম প্লেস রেস্টুরেন্ট" থেকে ফেরদৌস চাকমাকে জেএসএস কর্তৃক মটরসাইকেল যোগে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'CHT Voice' ও 'Secret Reporter'- সহ ইউপিডিএফের কিছু ফেসবুক আইডি থেকে জেএসএসকে জড়িয়ে ব্যাপক কাল্পনিক অপপ্রচার চালানো হয় এবং এর মাধ্যমে জেএসএসের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়।

এক পর্যায়ে এলাকার জনগণই ইউপিডিএফের উক্ত ভূয়া ও অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেয়। কথিত অপহৃত ফেরদৌস চাকমা বাড়িতে বহালতবিয়তে অবস্থান করছেন বলে জানায়।

ইউপিডিএফের ধর্মঘট উপেক্ষা করে যানবাহন চলাচল, গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ ও গুলি করার হুমকি

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক, মাচালং বাজার, উজো বাজার, বাঘাইহাট বাজার, পর্যটন এলাকা ও উদয়পুর রোডে গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

তবে স্থানীয় পরিবহন মালিক, চালক ও সাধারণ জনগণ সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করেই যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রেখেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ইউপিডিএফ মাচালং বাজার সংলগ্ন গ্রামগুলোর মধ্যে এগুজ্জেছড়ি, ৭ নম্বর, ৮ নম্বর, গঙ্গারাম ও ব্রিজপাড়ার সাধারণ গ্রামবাসীরা যাতে চুক্তির পক্ষীয় লোকদেরকে সহায়তা না দেয় তার জন্য জোরজবরদস্তি করছে। আর কোনো ধরনের সহায়তা করলে গ্রামবাসীদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ ও সরাসরি গুলি করার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। এতে করে উক্ত গ্রামগুলোর সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম প্রাণসংশয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে বলেও জানা গেছে।

স্থানীয়দের তথ্যমতে, এসব হুমকি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে ইউপিডিএফের একাধিক সশস্ত্র কমান্ডারের সক্রিয় ভূমিকার কথা উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বে রয়েছেন তথাকথিত কোম্পানি কমান্ডার রঞ্জন মনি চাকমা ওরফে আদে; প্লাটুন কমান্ডার সুপন চাকমা ওরফে রনি; সেকশন কমান্ডার রিপন চাকমা ওরফে জনম; প্লাটুন কমান্ডার গোপ্পো চাকমা ওরফে বিপ্লব; সেকশন কমান্ডার বানেশ্বর চাকমা ওরফে ধনেশ্বর।

এলাকাবাসীর দাবি, ইউপিডিএফের এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও সশস্ত্র হুমকির কারণে সাধারণ জুম্মদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও জীবিকা মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে।

লোগাঙে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৭ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২১ অক্টোবর ২০২৬ সন্ধ্যা ৬:৩০টার দিকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়ন এলাকা থেকে ৭ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়েছেন।

অপহৃত ব্যক্তিরা হলেন- (১) সোনাবি বাপ, গ্রাম- মাচ্ছুছড়া, লোগাং ইউনিয়ন; (২) দীপায়ন চাকমা, গ্রাম-ভারতবর্ষপাড়া, লোগাং ইউনিয়ন; (৩) নবিনে চাকমা, গ্রাম-ভারতবর্ষ পাড়া, লোগাং ইউনিয়ন; (৪) বিজয়গিরি চাকমা, গ্রাম- মাচ্ছুছড়া, লোগাং ইউনিয়ন; (৫) হেম রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- মাচ্ছুছড়া, লোগাং ইউনিয়ন; (৬) পুলক চাকমা (সুগত বাপ), গ্রাম-বাবুড়াপাড়া, চেঙেই ইউনিয়ন এবং (৭) হরেন ত্রিপুরা, গ্রাম-মাচ্ছুছড়া, লোগাং ইউনিয়ন।

অপহৃতরা সবাই পেশায় যাত্রীবাহী মোটরসাইকেলের চালক এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নেই



বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন আইচুক ত্রিপুরার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী লোগাঙের রাঙাপানিছড়া, বড়কোণা এলাকা থেকে উক্ত ৭ গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়।

সাজেকে প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, অতঃপর অবরোধ নাটক

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খুন, অপহরণ, হয়রানি, বেপরোয়া চাঁদাবাজি, গ্রামবাসীদের বেগার খাটানো, কথায় কথায় বাজার অবরোধ, সড়ক অবরোধ, জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস সহ নানা সন্ত্রাসী ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। মূলত ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে তারা সাজেকে ঘাটি গেঁড়ে বসে। সেই সময় থেকেই তারা সেখান থেকে অধিকাংশ বাঘাইছড়ি এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এপর্যন্ত এই এলাকায় তারা বহু নিরীহ মানুষ, চুক্তির সমর্থক গ্রামবাসীকে অপহরণ, খুন ও মারধর করেছে। তবে ইতোমধ্যে তারা বহু এলাকায় জনগণের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।

বিশেষ করে, সাজেক এলাকায় জনগণের অসহযোগ ও প্রতিরোধের ভয়ে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একদিকে জনগণের উপর নানাভাবে নিপীড়ন ও সন্ত্রাস চাপিয়ে দিচ্ছে, অপরদিকে তাদের কিছু দালাল ও সহযোগীর মাধ্যমে জোরপূর্বক কতিপয় গ্রামবাসীকে দিয়ে জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সড়ক অবরোধ নাটক, নারী-শিশুদের দিয়ে উস্কানিমূলক মিছিল-মিটিং আয়োজন করছে। বস্তুত ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে এলাকাবাসী ভেতরে ভেতরে চরম অতিষ্ঠ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশন ও সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে সাজেকের মাচলং বাজার ও উজো বাজার এলাকায় কয়েক দফায় যে সড়ক অবরোধ ডাকা হয়েছে তা ইউপিডিএফেরই নির্দেশে ও মদদে পরিচালিত ষড়যন্ত্রমূলক নাটক বলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, সাজেকের মাচলং এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে তথাকথিত 'জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের সরিয়ে নেয়া'র দাবিতে গত ১১ অক্টোবর এই সড়ক অবরোধ শুরু করা হয়। দুর্গোৎসবের কারণ দেখিয়ে ১৬-২১ অক্টোবর সড়ক অবরোধ স্থগিত করা হয়। যে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন সাজেকবাসীকে জিম্মি করে রেখেছে, সেই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরাই আবার জেএসএসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সড়ক অবরোধ ডাকাকে অনেকেই হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন।

সড়ক অবরোধ ও ইউপিডিএফের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাজেকের এক অসহায় গ্রামবাসী বলেন, 'সব বাধ্যতামূলক। কিছু করার নেই আমাদের। গ্রামবাসীরা এক নরকযন্ত্রণার মধ্যে বাসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। না পারছে সহ্য করতে, না পারছে কিছু বলতে। বাধ্য হয়েই ইউপিডিএফের মিছিল, সমাবেশে যেতে হচ্ছে, বাধ্য হয়ে তারা যা বলতে বলছে সেটাই বলতে হচ্ছে।'

রুপেশ চাকমা নামে এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন, 'কার দুঃখ দেখবো? এই মা-বোনেরা এই ধরনের অবরোধে যেতে না চাইলেও যেতে হচ্ছে বাস্তবতা সাপেক্ষে।' মিটিং-মিছিলে না গেলে ১,০০০ টাকা জরিমানা দিতে কিংবা এক বোঝা হাঙ্গর মাছ নিয়ে উপস্থিত হতে হুমকি প্রদান করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। ফলে গ্রামবাসীরা নির্যাতনের মিটিং-মিছিলে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়। কারও কারও অভিযোগ, পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই ইউপিডিএফ এসব করছে। এমনকি এলাকায় অপারেশন চালাতে সেনাবাহিনীর কাছেও আবেদন করে থাকে প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ।

উল্লেখ্য যে, গত ৩ আগস্ট ইউপিডিএফ অপপ্রচার চালায় যে, জেএসএস সাজেক পর্যটন এলাকা থেকে ফেরদৌস চাকমা নাকে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে, যা অচিরেই মিথ্যা ও সাজানো ঘটনা বলে প্রমাণিত হয়। এরপর ৫ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক, মাচালং বাজার, উজো বাজার, বাঘাইহাট বাজার, পর্যটন এলাকা ও উদয়পুর সড়ক এলাকায় চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে অনির্দিষ্টকালের জন্য যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়। তবে জনগণ ও যানবাহন চালকরা ইউপিডিএফের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে।

১০ জুন ভোরে ইউপিডিএফের সহ-সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও কোম্পানি কমান্ডার আদে চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের (প্রসিত) একটি সশস্ত্র দল সাজেক ইউনিয়নের কালু ছড়া (বোট ঘাট) নামক স্থানে পাঁচ ত্রিপুরা গ্রামবাসীর প্রায় ৮০০ মণ শুকনো হলুদ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। যা এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। এই সময় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, "ইউপিডিএফ যখনই কোনো বাৎসরিক চাঁদা দাবি করে তখন আমরা না দিয়ে থাকিনি। তারা (ইউপিডিএফ সদস্যরা) গ্রামে এসেও জোরপূর্বক শুকর, ছাগল কেটে ভাত খেয়ে যেতো। তারপরও তারা আমাদেরকে এতো বড় ক্ষতি করলো।"



এছাড়া, অভিযোগ রয়েছে, প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফের অনেক কমান্ডার আছেন যারা সাজেক এলাকায় আদা, হলুদ, মরিচ, তিল ইত্যাদি চাষ করেন এবং এসব পণ্যের ব্যবসা করেন। তারা প্রায়ই এলাকাবাসীর কাছ থেকে কম দামে এসব পণ্য ক্রয় করে অন্য সময় বা অন্য স্থানে বেশি দামে বিক্রি করেন। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতির শিকার হন। আরো দুঃখজনক অভিযোগ হচ্ছে, কোনো কোনো কমান্ডার হলুদ-আদা চাষ করার জন্য জঙ্গল কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুড়িয়ে দেওয়া, আদা-হলুদ লাগানো, আগাছা পরিষ্কার করা এবং পরিপক্ক হলে আদা-হলুদ তোলা ও পরিবহন করার জন্য সাজেকের নিরীহ জনগণকে বেগার খাটতে বাধ্য করেন।

বান্দরবানের রুমায় সেনাবাহিনী যেভাবে কৃষিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সেভাবে গত ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে প্রায় এক মাসব্যাপী সাজেক এলাকায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ঐ এলাকার অন্তত ২০ গ্রামের জুম্ম জনগণ চরম ভোগান্তির শিকার হন। ঐ এলাকার ইউপিডিএফের প্রধান চাঁদা সংগ্রহকারী চীফ কালেক্টর দলাপুনো চাকমার নেতৃত্বে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিষেধাজ্ঞার শিকার গ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে দাঁড়িপাড়া, ছয়নালছড়া, শূন্যছড়া, ছোটো কমলাক, বড় কমলাক, তালছড়া, খাগড়াছড়ি, লংকর, কিংকর, ঢেবাছিড়ি, ভুইয়োছড়া, তারাবানিয়া ঘাউদোমোর, রাঙাপানিছড়া, নুও আদাম, উদয়পুর, বাঘেইমোর, মঙ্গলি, ফিত্তিছড়া, গাছকাবাছড়া ইত্যাদি।

এছাড়া, চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালের ৭ অক্টোবর ইউপিডিএফের চাঁদা কালেক্টর দলাপুনো চাকমার (দলীয় নাম শিজক) নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল দক্ষিণ দাঁড়িপাড়া গ্রাম থেকে চন্দক চাকমা নামে এক নিরীহ জুমচাষীকে অপহরণ করে। অপরদিকে ১২ জুন ২০২৫ ইউপিডিএফের সশস্ত্র কমান্ডার উত্তম ও জনম এর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সাজেকের শেলথাই পাড়া, হাজ্জেপাড়া, জামপাড়া, অরুণপাড়া, লংটিয়ান পাড়া, তারুমপাড়া, নিউ টাংটাং, ওল্ড টাংটাং ইত্যাদি গ্রাম থেকে ডেকে নিয়ে ১৯ জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করে দুই দিন আটক করে রাখে এবং মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। ইউপিডিএফের দাবি অনুযায়ী মোটা অংকের চাঁদা দিতে না পেরে ব্যাপক মারধরের শিকার হয় ভূবনময় ত্রিপুরা (৪০) নামের এক জুমচাষী (২৩ এপ্রিল ২০২৫) এবং সাধনপ্রিয় চাকমা (৪৫) নামে এক ঝাড়ুফুল বিক্রেতা (৫ এপ্রিল ২০২৫)।

এছাড়া চাঁদা আদায়, ছোটোখাটো অভিযোগকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীকে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হয়রানি, মারধর করার ঘটনার অভিযোগ রয়েছে অসংখ্য।

সাজেকে প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ কৃত্রিম ইস্যু সৃষ্টি করে আন্দোলনের নামে জনগণের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে কৃত্রিম ইস্যু সৃষ্টি করে জোরপূর্বক জনগণকে সড়ক অবরোধে নামিয়ে জনগণের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে, জনগণকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত পাওয়া যাচ্ছে।

অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, সম্প্রতি সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশন ও সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ সাজেক এলাকায় মূলত যে ইস্যু নিয়ে সড়ক অবরোধ করছে সেটা আদৌ জনগণের ইস্যু নয়, জনগণের আন্দোলন নয়। জনগণকে জোরপূর্বক সেখানে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই তথাকথিত আন্দোলনে জনগণের কোনো স্বার্থ নেই। এইসব পর্যবেক্ষকদের মতে, সাজেক এলাকার মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, উন্নয়ন, নিরাপত্তা, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ইত্যাদি ইস্যুতে আন্দোলন প্রয়োজন হলেও, ইউপিডিএফের পকেট সংগঠনগুলো তা না করে ইউপিডিএফের সংকীর্ণ স্বার্থে আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে।

অপরদিকে, সাজেকের ভুক্তভোগী গ্রামবাসীদের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা নানা হুমকি দিয়ে, জোরজবরদস্তি করে গ্রামবাসীদের মিছিল, সমাবেশ ও অবরোধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এই ঘোষণা দিয়েছে যে, এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১০ বেতের শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি কোনো পরিবার যদি কোনো কারণে এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে সেই পরিবারকে দৈনিক মজুরি দিয়ে হলেও অন্য লোক ভাড়া করে কর্মসূচিতে পাঠাতে হবে বলে নির্দেশ দেয় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

এছাড়া ইউপিডিএফের কর্মীরা এটাও ঘোষণা করে যে, তাদের ডাকা মিছিল, সমাবেশ ও অবরোধে যারা অংশগ্রহণ করবে, তাদের ভাত, নাশতা এবং ১,০০০ টাকা বকশিশ দেওয়া হবে। আর যারা অংশগ্রহণ করবে না, তাদের বিরুদ্ধে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



ইউপিডিএফের সশস্ত্র কর্মীরা গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে বলে যে, "আমরা যদি সাজেক এলাকায় থাকতে না পারি, তাহলে এই সাজেক এলাকায় শান্তিবাহিনী থাকলে তোদের ঘরে আগুন দেবে, তোদের মেরে ফেলবে। কারণ, তোমরা সবাই মিছিল-সমাবেশে গেছো, জেএসএস দেখে ফেলেছে। তারা তোদের ক্ষমা করবে না।"

তারা গ্রামবাসীদের এটাও বলেছে যে, "যেকোনোভাবে মিছিল, সমাবেশ ও অবরোধের ডাক দিয়ে হলেও সেনাবাহিনীর অভিযান পরিচালনার দাবি জানাতে হবে।"

ইউপিডিএফের কর্মীরা আরও নির্দেশ দেয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে হলে জেএসএসের বিরুদ্ধে পোস্ট করতে হবে, না হলে আইডি শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একই সঙ্গে তারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করে বলেছে যে, "আমরা যে এসব কথা বলেছি, তা যেন বাইরে প্রকাশ না হয়।"

তবে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে মামলা হলে বা হয়রানি করা হলে ইউপিডিএফ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, তারা থাকার জায়গা দেবে বলেও জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি সাজেক কার্বারি অ্যাসোসিয়েশন ও সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে সাজেকের মাচলং বাজার ও উজো বাজার এলাকায় কয়েক দফায় ইউপিডিএফের নির্দেশে ও মদদে সড়ক অবরোধ শুরু হয়। সাজেকের মাচলং এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে তথাকথিত 'জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের সরিয়ে নেয়া'র দাবিতে গত ১১ অক্টোবর এই সড়ক অবরোধ শুরু করা হয়। দুর্গোৎসবের কারণ দেখিয়ে ১৬-২১ অক্টোবর সড়ক অবরোধ স্থগিত করা হয়। গত ২২ অক্টোবর থেকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িব্যাপী এই সড়ক অবরোধ সম্প্রসারণ করা হয়। তবে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির অধিকাংশ এলাকায় এই সড়ক কার্যকর হয়নি বলে জানা গেছে।

যে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন সাজেকবাসীকে জিম্মি করে রেখেছে, সেই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরাই আবার জেএসএসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সড়ক অবরোধ ডাকাকে অনেকেই হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাজেক ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খুন, অপহরণ, হয়রানি, বেপরোয়া চাঁদাবাজি, গ্রামবাসীদের বেগার খাটানো, কথায় কথায় বাজার অবরোধ, সড়ক অবরোধ, জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস সহ নানা সন্ত্রাসী ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত এই এলাকায় তারা বহু নিরীহ মানুষ, চুক্তির সমর্থক গ্রামবাসীকে অপহরণ, খুন ও মারধর করেছে। তবে ইতোমধ্যে তারা বহু এলাকায় জনগণের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে বলে জানা গেছে।

অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

রামগড়ে একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলা, আহত ৬



খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলায় সোনাই আগা নামক স্থানে গত ২২ জুলাই ২০২৬ সকাল আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় বাজারে যাওয়ার পথে একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক স্থানীয় জুম্মদের উপর হামলা, মারধর ও মালামাল লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় উক্ত হামলায় নারীসহ অন্তত ৬ জন আহত হন।

আহত ব্যক্তিরা হলেন– ১) স্নেহকুমার চাকমা (৪০), ২) রবি শান্তি চাকমা (৩৮), ৩) লক্ষীকুমার চাকমা (৪৫), ৪) বিন্দু চাকমা (৪১), ৫) সোনাদেবী চাকমা (৩৭) ও ৬) গুরিমিলা চাকমা (৩৯)।

স্থানীয় সূত্র মোতাবেক, সেদিন সকালে নাঙ্গেল পাড়ায় বসবাসরত ভুক্তভোগীরা নিজেদের উৎপাদন করা কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য মো: দিদার নামে এক টমটম চালকের গাড়িতে করে রামগড় বাজারে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তারা সোনাই আগা এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয় মো: ইউনুস (আবুল কালাম) ও সেটেলার বাঙালি মো: ইউসুবের নেতৃত্বে ৭ জনের একটি দল তাদের গতিরোধ করে অতর্কিত হামলা চালায়। জানা যায়, মো: ইউসুবের নামে অবৈধ চাঁদা তোলা সহ বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।



এই সময় হামলাকারীরা স্নেহকুমার চাকমার কাছ থেকে একটি বাটন মোবাইল ফোন, দুটি রবি সিম ও একটি গ্রামীণফোন সিম এবং অন্য একজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া নগদ ৪ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া বাজারে বিক্রির জন্য নেওয়া ৩২টি কলা ও প্রায় ২ মণ কাঁচা সবজিও লুট করে নিয়ে যায়। উক্ত হামলায় গুরুতর আহত স্নেহকুমার চাকমা অর্থাভাবের কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারেননি।

বাঘাইছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টা, এক জুম্ম গুরুতর আহত



গত ২৭ জুলাই ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়ন এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের একটি দল স্থানীয় জুম্মদের ভূমি বেদখলের চেষ্টার সময় জুম্মদের উপর হামলা চালিয়েছে।

এসময় সেটেলার বাঙালিদের হামলায় ধারালো দা'এর আঘাতে খেদারমারা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পাবলাখালী এলাকার বাসিন্দা মহেন্দ্র চাকমা (৫৫), পীং-মনোভদ্র চাকমা নামে এক জুম্ম গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছেন। নিজের ভূমি বেদখলে বাধা দিতে গিয়ে মহেন্দ্র চাকমা এই হামলার শিকার হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেদিন সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলার সীমান্তবর্তী দক্ষিণ পাবলাখালির স্থানীয় জুম্ম অধিবাসী মহেন্দ্র চাকমা (৫৫), নোবেল চাকমা (৩৪), চিরঞ্জীব চাকমা (৫৫) ও চিজিমুনি চাকমা (৩০)-এর জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে লংগদু উপজেলা থেকে মো: কুদ্দুস, মো: মনির ও মো: বেলালের নেতৃত্বে আনুমানিক ১৫ জন সেটেলার বাঙালি জায়গা পরিষ্কার করতে আসে।

বিষয়টি জানতে পেরে মহেন্দ্র চাকমা তৎক্ষণাৎ সেখানে বাধা দিতে যান এবং ঐ জায়গা থেকে মো: কুদ্দুস ও অন্যান্যদের বাড়িতে চলে যেতে বলেন। কিন্তু কুদ্দুস জায়গাটি দক্ষিণ পাবলাখালি গ্রামের মিটন চাকমা (৩৮), পিতা-মঙ্গল কুমার চাকমা'র কাছ থেকে অনেকদিন আগে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে দাবি করে চলে যেতে অপারগতা জানায়।

অন্যদিকে মিটন চাকমার (বর্তমানে চট্টগ্রামে কোম্পানিতে চাকরি করেন) সাথে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক মুঠোফোনে আলাপ করা হলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং বলেন, এ বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না।

এ নিয়ে তাদের উভয়পক্ষের মধ্যে বিস্তর বাগবিতণ্ডা হয় এবং একপর্যায়ে মহেন্দ্র চাকমার উপর দা দিয়ে হামলা চালায় সেটেলাররা। পরে আশেপাশের স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘটনাটি টের পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সেটেলারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেটেলাররা সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং গ্রামবাসীরা মহেন্দ্র চাকমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য, বাঘাইছড়ি এবং লংগদুর উক্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় ভূমি নিয়ে স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসী ও সেটেলারদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পাতাছড়া ক্যাম্প কমান্ডার মেজর হারুনুর রশিদ মির্জা লংগদু উপজেলা সীমান্তবর্তী গ্রাম উত্তর রহমতপুর হতে গোলটিলা পুলিশ ক্যাম্প বরাবর পশ্চিমে পাশে সেটেলার ও পূর্বে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন হেদারমারা ইউনিয়নের দক্ষিণ পাবলাখালী গ্রামটি জুম্মদের জন্য সীমান্ত নির্ধারণ করে দেন। এতদসত্ত্বেও সেটেলাররা সীমানা লঙ্ঘন করে জুম্মদের জায়গা বেদখলের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে বহুদিন ধরে। ফলে প্রায়ই সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের সাথে সংঘর্ষ লিপ্ত হচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

বরকলে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর ভূমি বেদখলের চেষ্টা



রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বরকল সদর ইউনিয়ন এলাকায় একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর রেকর্ডভুক্ত ভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত ২৭ জুলাই ২০২৬ রাত আনুমানিক ৯:৩০ টায় বরকল সদর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিলছড়া গ্রামে।



ভুক্তভোগী ভূমির মালিকের নাম ত্রিদীপ চাকমা। তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন সাবেক সদস্য। উক্ত জমি ১৯৭৬ সালে ত্রিদীপ চাকমার নামে বন্দোবস্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সেদিন রাত আনুমানিক ৯:৩০ টার দিকে সুবলং এলাকার বরুনাছড়ি সেটেলার এলাকা থেকে আগত সেটেলার বাঙালিদের একটি দল ত্রিদীপ চাকমার জমির ওপর থাকা একটি খামার ঘর ভেঙে দিয়ে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করার চেষ্টা করে। এমনকি সেটেলার বাঙালিরা ভূয়া দলিল দেখিয়ে উক্ত জমি নিজেদের বলে দাবি করে।

এরপর গত ২৮ জুলাই বরকল থানা পুলিশ স্থানীয় বিজিবির সহযোগিতায় ভূমির মূল দলিল যাচাই করে বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেয় এবং সেটেলার বাঙালিদের নির্মাণাধীন বাড়িটি নির্মাণ না করার নির্দেশ দেয়।

লংগদুর বৈরাগী বাজারে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা, এক জুম্ম নারী প্রহৃত

গত ৩১ জুলাই ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার বগাচতর ইউনিয়নের বৈরাগী বাজারে সেটেলার বাঙালিদের একটি দল জুম্মদের ধাওয়া ও হামলা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে। এসময় বাজারে আসা এক জুম্ম নারী ব্যাপক মারধরের শিকার হয়। ওই জুম্ম নারীর পরিচয় কালেন্দী চাকমা (৩০), স্বামী- তপরায় চাকমা, গ্রাম- রাঙ্গীপাড়া, ১নং ওয়ার্ড, ৪নং বগাচতর ইউনিয়ন, লংগদু।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন হাটের দিন সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে লংগদু উপজেলার বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত চিবেরেগা এলাকার সেটেলার বাঙালি মো: খলিল (৪৫) ও মো: নুর নবীর নেতৃত্বে সাইফুল, আবুল বশর, এনামুল, আল আমিন, হৃদয়সহ ৩০/৩৫ জনের একটি দল লাঠিসোটা নিয়ে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথা বলে বৈরাগী বাজারে আসা জুম্মদের উপর হামলা করার চেষ্টা করে। এসময় সেটেলাররা লাঠিসোটা নিয়ে নির্বিচারে জুম্মদের ধাওয়া শুরু করে।

কোনো প্রকার উস্কানি ছাড়াই সেটেলার বাঙালিদের আকস্মিক এই হামলায় জুম্মরা যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে। এই সময় কালেন্দী চাকমা নামের জুম্ম নারীটি ব্যাপক মারধরের শিকার হয়।

বিষয়টি দ্রুত জানাজানি হলে লংগদুর রাজানগর জোন হতে বিজিবি'র একটি দল তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, উক্ত হামলায় নেতৃত্বদানকারী সেটেলার মো: খলিলের রাঙ্গামাটি সদরের আসামবস্তিতে সৃজন করা পেঁপে বাগানটি গতরাতে (৩০ জুলাই) কে বা কারা কেটে দিয়েছে। সেই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মো: খলিল লংগদুতে জুম্মদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে।

উখিয়ায় মুসলিম বাঙালি সম্প্রদায় দ্বারা বৌদ্ধ বিহারে হামলা, মূর্তি ও ঘর ভাঙচুর



কক্সবাজারের উখিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে "ছেনছড়ি বৌদ্ধ বিহারে" মুসলিম বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়েছে। হামলায় বৌদ্ধ বিহারের অন্তত ৩টি বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর ও অন্তত চারটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। গত ৩১ জুলাই ২০২৬ আনুমানিক বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কক্সবাজার উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের ছেনছড়ি এলাকায় "ছেনছড়ি বৌদ্ধ বিহারে" ও বিহারের আশেপাশের বাড়িঘরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সরদার মং চৌধুরীর অভিযোগ, ২০০৭ সাল থেকে চলমান জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে স্থানীয় নুরুল হকের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জনের একটি দল বন বিভাগের উপস্থিতিতে সংঘবদ্ধ হামলা চালায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মারধর ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার আদিবাসী শিক্ষার্থী লেবানন বম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের সংস্কৃত বিভাগের আদিবাসী শিক্ষার্থী লেবানন বম নিজ মেসে হামলা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। গত ১৯ আগস্ট ২০২৬ সকাল আনুমানিক ৯:০০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি আবাসিক মেসে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর অভিযোগ, তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মেসের



বাসিন্দা হাসান তার ওপর হামলা চালান। পরে আশপাশের লোকজনকে ডেকে এনে দ্বিতীয় দফায় হাসানের স্ত্রীসহ কয়েকজন তার ওপর চড়াও হন। এ সময় লেবাননকে কিল-ঘুষি এবং ইট দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে তার মুখ, গলা ও পিঠে আঘাত লাগে বলে জানা গেছে।

লেবাননের অভিযোগ, হামলার সময় তাকে 'পাহাড়ি', 'অসভ্য', 'তোরা পাহাড় থেকে আসছিস'সহ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হয়। একপর্যায়ে হামলাকারী হাসানের স্ত্রী বটি খুঁজছিলেন এবং তাকে জবাই করে ফেলার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ করেছেন লেবানন। ঘটনার সময় লেবাননের সঙ্গে একই কক্ষে ছিলেন একই বর্ষের শিক্ষার্থী ওসল চাকমা। তিনি বিষয়টি সিনিয়র শিক্ষার্থী সুমন চাকমাকে জানান। পরে সুমন চাকমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানকে বিষয়টি অবহিত করেন। খবর পেয়ে প্রক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

এদিকে ঘটনার পর অভিযুক্ত হাসান মেস ছেড়ে চলে যান। পরে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে পুলিশ তাকে প্রক্টর কার্যালয়ে নিয়ে আসে। সেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অভিযুক্ত হাসানের মধ্যে ঘটনার জন্য কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি; বরং তিনি উগ্র আচরণ করেছেন। পরে লেবাননের বিভাগের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে তার বক্তব্য নেওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্ত হাসানকে চন্দ্রিমা থানায় নিয়ে যায়।

অভিযুক্ত হাসান নিজেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন ঘটনায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য ও জাতিগত পরিচয়কে আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পরে লেবাননের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে শিক্ষার্থীরা চন্দ্রিমা থানায় যান। সেখানে তার নিরাপত্তার জন্য একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয় এবং হামলার ঘটনায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, মামলা না করার জন্য অভিযুক্তর পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী লেবানন বম মামলা দায়ের করেছেন। শিক্ষার্থীরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, হামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

খাগড়াছড়িতে আদালতের রায় উপেক্ষা করে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর জমি বেদখল, মধ্যরাতে ঘর নির্মাণ



খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের গামারিঢালায় আদালতের রায় উপেক্ষা করে এক জুম্ম গ্রামবাসীর পৈত্রিক জমি বেদখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকজন সেটেলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় চরম উত্তেজনা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৮ আগস্ট ২০২৬, শনিবার দিবাগত রাতে গামারিঢালা মৌজার নতুন পাড়ার বাসিন্দা সেটেলার মো: মঈনুল ইসলাম, পিতা: মো: মোজাম্মেল হক; মো: সামাদ, পিতা: শমশের আলী বিশ্বাস ও সাহেরা বেগম, পিতা: মোহাম্মদ শেখ তাদের সহযোগীদের নিয়ে জমিটি বেদখলের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা যায়, উক্ত জমিটির মূল মালিক কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত প্রজা স্বর্গীয় প্যারী মোহন চাকমা। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার গামারীঢালা মৌজায় আরএস খতিয়ান নং- ০৫ এর অধীনে বিভিন্ন দাগে সর্বমোট ৭.৯৫ একর ভূমি বন্দোবস্তি পেয়ে ভোগদখল করে আসছিলেন। ২০০৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ জমিটিতে এজমালি দখলে রয়েছেন। বর্তমানে প্যারী মোহন চাকমার সন্তান ও জমির ওয়ারিশ বৈরী মিত্র চাকমা খাগড়াছড়ি সদরের অপর্ণা চৌধুরী পাড়ায় বসবাস করেন।

ঘটনার পটভূমি পর্যালোচনায় দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তরা জমিটি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। গত



বছরের (২০২৫) ২৬ জুলাই বৈরী মিত্র চাকমা শ্রমিক নিয়ে জমি পরিষ্কার করতে গেলে অভিযুক্ত সেটেলাররা বাধা দেয় এবং বেড়া ভেঙে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এ ঘটনায় জমি বেদখলের আশঙ্কায় গত ২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে বাদী বৈরী মিত্র চাকমা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় মামলা দায়ের করেন।

মামলা ও তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, খাগড়াছড়ি সদর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সরেজমিন তদন্ত শেষে বাদীদের নিরঙ্কুশ দখলের পক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর ভিত্তিতে গত ২৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে খাগড়াছড়ি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মারুফ মামলাটি নিষ্পত্তি করে বাদী বৈরী মিত্র চাকমার পক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ে আদালত উল্লেখ করেন, বাদী নালিশী ভূমিতে তাঁর নিরঙ্কুশ ভোগদখল প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে দখলদার সাব্যস্ত করা হলো এবং অন্য কোনো আদালতের ভিন্নরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ওই ভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ (বারিত) করা হলো।

আদালতের এই নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শনিবার মধ্যরাতে আসামিরা জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে ঘর নির্মাণ করে দখলে নেয়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে আদিবাসী চাকদের ধর্মীয় শ্মশানের জায়গা দখলের চেষ্টা



বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চাক পাড়ায় দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত একটি ধর্মীয় শ্মশানের জায়গা দখলের অপচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় আদিবাসী চাক সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মরদেহ সৎকারের কাজে এই শ্মশানটি ব্যবহার করে আসছেন। ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থানের জায়গা দখলের ঘটনায় স্থানীয় চাকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় নূর মোহাম্মদ, পিতা-মৃত সিকান্দার আলী শ্মশানের জায়গাটিকে নিজের দাবি করে বেশ কিছুদিন ধরে দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, নূর মোহাম্মদের বাবা জীবিত থাকাকালীন এই জমি নিয়ে কখনো কোনো ধরনের বিরোধ বা মালিকানার দাবি উত্থাপিত হয়নি। অথচ সম্প্রতি প্রভাব খাটিয়ে শ্মশানের চারপাশের ঘেরা কেটে ফেলা হয়েছে এবং জমিটি দখলের প্রত্যক্ষ চক্রান্ত চলছে।

ধর্মীয় অনুভূতির ওপর আঘাত ও দখলের এই চেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন স্থানীয় আদিবাসী চাক সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা জানান, শ্মশান কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না, এটি একটি পুরো সম্প্রদায়ের আবেগ, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অধিকারের অংশ। কোনো পক্ষের যদি বৈধ কোনো দাবি থেকেও থাকে, তবে তা আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, জোরজবরদস্তি বা ভয়ভীতি দেখিয়ে নয়।

ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় চাকরা নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত আবেদন দায়ের করেছেন। তবে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরও শ্মশানের সীমানা প্রাচীর বা ঘেরা কেটে ফেলার ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, "দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত একটি ধর্মীয় স্থান নিয়ে বারবার বিরোধ তৈরি হওয়ার পরও যদি কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের জন্য কোথায় যাবে?"

লংগদুতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ৯ রোহিঙ্গা আটক



গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ বাজার হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নারীসহ ৯ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী আটক হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আটককৃতরা নিজেরাই রোহিঙ্গা বলে এবং তারা কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প হতে চলে এসেছেন বলেও স্বীকার করেছে।



গত ২ সেপ্টেম্বর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল অভিযান চালিয়ে মাইনী বাজারের মাইনীমুখ লঞ্চঘাট এলাকা থেকে উক্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আটক করে। আটককৃতদের লংগদু থানা পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুসারে, আটককৃতদের নাম– মো: সাব্বির, মো: নুমাইর, মো: শাওন, মো: আব্দুল হাফেজ, মো: নুরুল আমিন, মো: হোসেন, মো: তৈয়ব, মোছাম্মদ ছাকিবুন ও মোছাম্মদ তহুরা।

অপর একটি সূত্রে জানা যায়, লংগদুতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে আরও কিছু রোহিঙ্গা থাকতে পারে। সূত্রটি জানায়, উক্ত আটককৃতরা সহ অন্তত ১২ জন ব্যক্তি ২ সেপ্টেম্বর সকালে রাঙ্গামাটি শহর এলাকা থেকে স্পিড বোট ভাড়া করে লংগদুর মাইনীমুখ বাজারে যায়। উক্ত ১২ জনের মধ্যে ৯ জন আটক হলেও বাকী ৩ জন কারা তা জানা যায়নি। স্থানীয়দের ধারণা, বাকী ৩ জন হয় রোহিঙ্গা শরণার্থী, অথবা পাচারকারী দালালচক্রের লোক।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে বাধা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে চলেছে। বিভিন্ন সময় অনুপ্রবেশকালে অনেক রোহিঙ্গা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট আটক হলেও পাচারকারী দালালচক্র ও প্রশাসনের কায়েমি স্বার্থবাদীদের সহায়তায় অনেক রোহিঙ্গা গোপনে বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশ করছে এবং অবস্থান করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে শত শত রোহিঙ্গা বান্দরবান সহ তিন পার্বত্য জেলায় অনুপ্রবেশ করেছে বলে দীর্ঘ দিনের অভিযোগ রয়েছে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মর জায়গা বেদখলের চেষ্টা, বাধা প্রদানে প্রাণনাশের হুমকি



রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন ৪ নং ওয়ার্ডের ভাইবোনছড়া এলাকায় জুম্মদের জায়গায় ঢুকে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকার সময়ে ২ জন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মর জায়গা বেখদল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বেদখলকারী সেটেলার বাঙালিদের পরিচয়: ১) ছাত্তার (৪৩), পিতা: মো জসিম উদ্দিন ও ২) মো: জয়নাল (৬০), পিতা- অজ্ঞাত। আনোয়ার টিলা নামক স্থানে তাদের উভয়ের বাড়ি।

সূত্র মোতাবেক, গত রবিবার উক্ত দুই সেটেলার বাঙালি প্রকৃত মালিক রেলি কুমার চাকমা, পিতা: মৃত যোগেন্দ্র চাকমা এর বন্দোবস্তীকৃত ৩নং লংগদু মৌজায় অবস্থিত হোল্ডিং নং জ-৩৬৫/৩৪ এর অন্তর্ভুক্ত ৪.০০ (চার) একর জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তাদের মতো করে জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকে। পরে জায়গার মালিক বাধা প্রদান করতে গেলে সেটেলার বাঙালিরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে বলে খবর পাওয়া যায়।

জানা যায়, এর আগেও সেটেলার বাঙালিরা উক্ত জায়গাটি বেদখল করার চেষ্টা চালিয়েছিল। পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে জায়গাটি কোনো পক্ষই দাবি করতে পারবে না বলে ঘোষণা করা হয়। অথচ জায়গার প্রকৃত মালিক রেলি কুমার চাকমা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ৫ বছর পর আবারও সেটেলার বাঙালিরা উক্ত জায়গাটি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ডাকাতির চেষ্টা ও সেগুন কাঠ চুরি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন জীবতলী এলাকায় সশস্ত্র একদল সেটেলার বাঙালি এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা করেছে এবং অপর জুম্ম গ্রামবাসীর কর্তনকৃত প্রায় ২ লক্ষ টাকার সেগুন কাঠ চুরি করে নিয়ে গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ অক্টোবর ২০২৬ মধ্যরাত আনুমানিক পৌনে ২ দুইটার দিকে একদল সেটেলার বাঙালি রাঙ্গামাটির ১নং জীবতলী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের পানছড়ি গ্রামের বাসিন্দা অমৃত লাল চাকমা (৫৫), পীং-লালেন্দ্র চাকমা-এর বাড়িতে ডাকাতি করতে আসে।

ডাকাতরা অনেকক্ষণ বাড়ির দরজা খুলতে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে। কিন্তু বাড়িটি মাটির তৈরি গুদাম ঘর এবং দরজা শক্ত হওয়ায় তারা বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। তবে অনেকক্ষণ ধরে তারা বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী বাড়ির লোকদের চিৎকারে ও গ্রামবাসীদের ডাকাডাকিতে চারদিক থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে থাকলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

ডাকাতদের অন্তত তিনজনের হাতে পিস্তল ছিল বলে বাড়ির লোকেরা দেখতে পায়। এছাড়া, ভুক্তভোগী পরিবার ও



গ্রামবাসীদের সূত্রে, অন্তত ৪ জন ডাকাতকে চিনতে পারা যায় বলে জানা গেছে।

চিহ্নিত ৪ ডাকাত হলো– ১। মো: জুয়েল (২১), পিতা- মো: আক্তার, ২। মো: মাঈন উদ্দিন (২৩), পিতা-মো: সারোয়ার, ৩। মো: ইকবাল (২০), পিতা মো: শাহীনুর আহম্মদ ৪। মো: আলম (২২) পিত-অজ্ঞাত। তাদের সকলের বর্তমান ঠিকানা- গবঘোনা সেটেলার বাঙালি পাড়া, জীবতলী ইউনিয়ন বলে জানা গেছে।

এদিকে অমৃত লাল চাকমার বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উক্ত সেটেলার বাঙালিরা ফেরার পথে জীবতলী ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার শান্তিরাণী চাকমার নিজস্ব বাগানের কর্তন করে রাখা প্রায় ১৫০ ফুট সেগুন গাছ বোটে তুলে নিয়ে যায়। ঐ গাছগুলো কেটে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, প্রয়োজনের সময় বিক্রির উদ্দেশ্যে। গাছগুলোর বিক্রয় মূল্য ২ লক্ষ টাকার অধিক বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, ডাকতরা যখন ডাকাতি চেষ্টার পর শান্তিরাণী চাকমার গাছগুলো চুরি করে বোটে কাপ্তাই হ্রদ এলাকা দিয়ে ফিরছিল, ঐ সময়ে আশেপাশের হ্রদ এলাকায় স্থানীয় গবঘোনা সেনা ক্যাম্পের ১৫ জনের একটি সেনাদল ইঞ্জিন চালিত বোটে টহল দিচ্ছিল। এই ঘটনা একদল জেলে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় বলে জানা যায়।

একদিকে সেটেলারদের ডাকাতির চেষ্টা, গাছ চুরি করে নিরাপদে ঘরে ফেরা, অপরদিকে সেনাবাহিনীর টহল- এই ঘটনা স্থানীয় জনগণের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, গবঘোনা সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে তাদের গোয়েন্দা সোর্স হিসেবে কিছু সেটেলার বাঙালিকে নিয়োগ দিয়েছে এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্রও দিয়েছে। ঐ সেটেলার বাঙালিরা দীর্ঘদিন স্থানীয় জুম্মরা তাদের নিজস্ব গাছ/বাঁশ বিক্রি করলেই বিভিন্ন অংকের চাঁদা দাবি করে হয়রানি করে আসছে।

লামা-সরইয়ে ভুয়া দলিলে জমি দখল, হুমকি ও হয়রানির অভিযোগ: বরখাস্ত হেডম্যান পুনর্বহালের দাবি

বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে ভুয়া ভূমির দলিল তৈরি, জমি দখল, হুমকি ও হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগী এলাকাবাসী। মানববন্ধনে সাধারণ মানুষের ভোগদখলীয় জমি রক্ষা এবং ডলুছড়ি মৌজার বরখাস্ত হওয়া হেডম্যান যোহন ত্রিপুরাকে দ্রুত পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

গত ২২ অক্টোবর, সকালে বান্দরবান প্রেসক্লাবের সামনে 'সরই এলাকার সর্বস্তরের জনগণ'-এর ব্যানারে উক্ত মানববন্ধন



অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরই ইউনিয়নের হাজিরাম ত্রিপুরা ও পাইনসা প্রু ত্রিপুরাসহ একটি প্রভাবশালী চক্র ভুয়া ভূমির দলিল তৈরি করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি ও হুমকি দিয়ে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন রাবার কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে জাল দলিলের মাধ্যমে প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করে সরই এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগদখলীয় ও হেডম্যান প্রতিবেদনপ্রাপ্ত জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। পরবর্তীতে এসব জমি লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি, মেরিডিয়ান কোম্পানি ও এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন খানের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

বক্তারা আরও জানান, ডলুছড়ি মৌজার হেডম্যান যোহন ত্রিপুরা সাধারণ মানুষের ন্যায্য ভূমির অধিকার ও যৌক্তিক দাবির পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। হাজিরাম ত্রিপুরা, কাইং প্রে ম্রো, পাইনসা প্রু ত্রিপুরা, জগদীশ ত্রিপুরা, হাজরাই ত্রিপুরা ও সূর্যমানিক ত্রিপুরাসহ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন প্রশাসনের কাছে জমা দিয়ে তাকে বরখাস্ত করানো হয়েছে। হেডম্যানের বরখাস্তের সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের শত শত একর জমি বেদখল করা হয়েছে এবং প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে এলাকাছাড়া করার অপচেষ্টা চলছে।

মানববন্ধন থেকে বরখাস্তকৃত হেডম্যান যোহন ত্রিপুরাকে অবিলম্বে স্বপদে পুনর্বহাল, জমি দখল ও হয়রানির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং সাধারণ মানুষের ভূমির অধিকার সুরক্ষায় প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান ভুক্তভোগীরা।

মানববন্ধনে সরই ইউনিয়নের এলাকাবাসীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন মো: ইকবাল, রনি মাস্টার ও চিংহ্লা মং মারমা কার্বারীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।



যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

চবির এক আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থীকে বাসে শ্লীলতাহানির চেষ্টা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সমাজতত্ত্ব বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের এক জুম্ম শিক্ষার্থীকে খাগড়াছড়িগামী একটি লোকাল বাসে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়েছে। অভিযুক্ত মোহাম্মদ জসিমের (৩৫) বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুর এলাকায়। তাঁর বাবার নাম মৃত তোফায়েল আহমেদ।

ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ জুলাই ২০২৬, শুক্রবার বেলা দুইটার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট থেকে খাগড়াছড়িগামী একটি লোকাল বাসে উঠে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন ওই জুম্ম শিক্ষার্থী। এ সময় তাঁর পেছনের আসনে বসা মোহাম্মদ জসিম নামের এক বাঙালি সিগারেটের ছাই ফেলার অজুহাতে তাঁর শরীরে স্পর্শ করেন। ওই শিক্ষার্থী প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন এবং হুমকি দেন।

পরে অন্য যাত্রীদের হস্তক্ষেপে হাটহাজারী এলাকায় অভিযুক্তকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসহ বাস থেকে নেমে যেতে বাধ্য করেন।

পরে বাসটি ফটিকছড়ির একটি বাসস্ট্যান্ডে থামলে, ঐ ব্যক্তি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে বাসের পিছু পিছু ছুটে এসে আবারও ওই বাসে ওঠেন এবং জুম্ম শিক্ষার্থীকে চুলের মুঠি ধরে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বাস থেকে নামানোর চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এরপর ভুক্তভোগী জুম্ম শিক্ষার্থী ফটিকছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ১০ ধারায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ মামলা রুজু করে এবং অভিযুক্ত মো: জসিমকে গ্রেপ্তার করে বলে জানা গেছে।

মহালছড়িতে এক ত্রিপুরা নারী হত্যার শিকার



গত ২৮ আগস্ট ২০২৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের কার্বারি পাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে একা থাকা অবস্থায় নিকা ত্রিপুরা (৩০) নামে এক জুম্ম নারী অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ধর্ষিত হওয়ার পর নিকা ত্রিপুরা হত্যাকান্ডের শিকার হন। হত্যাকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীর বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্রও চুরি করে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর স্বামী সেতু ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে আনসার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সংগঠন সংবাদ

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১৫তম সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

"সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে নারী সমাজ অধিকতর সামিল হউন" শ্লোগানে গত ১০ জুলাই ২০২৬, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১৫তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি স্টাফ সদস্য রুমেন চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা প্রমুখ।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি এলি চাকমা সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী কমিটির



সাংগঠনিক সম্পাদক সূচনা চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সম্মলেন ও কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রেশমি চাকমা।

রুমেন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। শাসকগোষ্ঠী ভাগ কর শাসন কর নীতির মধ্য দিয়ে জুম্মদেরকে নিপীড়ন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট করে রেখেছে। সেজন্য জুম্ম নারী সমাজকে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব থেকে বের হয়ে এসে পুরুষের পাশাপাশি আন্দোলন সংগ্রামের হাল ধরতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে নিয়মতান্ত্রিক কিংবা অনিয়মতান্ত্রিক উভয় পথে ছাত্র কিংবা ছাত্রী সমাজকে অধিকতরভাবে সামিল হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যেকোন ষড়যন্ত্র নির্মূলকরণ তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ম্রানুচিং মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীসমাজ একদিকে বিজাতীয় শাসন-শোষণ অপরদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বারা সমাজের শাসন-শোষণের শিকার। তবে এইটাও সত্যি, ইতিহাসে প্রতিটি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীদের পরিবার ও সমাজের নানা বাধা অতিক্রম করে রাজনীতিতে আসতে হবে।

রিনা চাকমা বলেন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন শুধু একটি সংগঠন নয় এটি একটি শিক্ষার পাঠশালা এবং অন্যায় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়া হিল উইমেন্স ফেডারেশন আজ ৩৮ বছর এখনো তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন জুম্ম নারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন তাই এই সংগঠনের সকল নেতাকর্মীদের আরো রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

সজল চাকমা বলেন,পাহাড়ের সমাজ ব্যবস্থা এখনো সামন্তীয় ঘুণেধরা। এখানে নারীদেরকে এখনো দমিয়ে রাখা হয়, তাদের মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে অনেক নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেও একটা ভয়ের দ্বিধায় ভুগে। তাই প্রান্তিক সমাজ থেকে যারা উঠে এসে যারা কলেজে ভর্তি হবেন তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

সম্মেলন ও কাউন্সিল শেষে সেবিকা চাকমাকে সভাপতি, সুষ্টি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জগতী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা গঠন করা হয়।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র নবীন বরণ ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ), রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে "আলোর দিশারী নবীন হে নবীন প্রাণ, চেতনায় জাগরিত রেখো শেকড়ের টান"–এই স্লোগানকে সামনে রেখে 'নবীন বরণ ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৩ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন



করা হয়। এতে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি ১ম বর্ষ ও স্নাতক ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি জ্ঞান চাকমা। পিসিপি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত চাকমা ও এইচডাব্লিউএফ সাধারণ সম্পাদক সুষ্টি চাকমার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি কলেজ শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রিয়ন্তি চাকমা। নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন অনার্সের শিক্ষার্থী ঐশী চাকমা এবং নবীনদের পক্ষে বক্তব্য দেন এইচএসসি ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী কনন মহন চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য অ্যাডভোকেট চঞ্চু চাকমা বলেন, "শিক্ষাকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও মানবিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। জুম্ম সমাজের একটি অংশের চেতনা বোধের অভাব ও অলসতার কারণে আমরা আজ পিছিয়ে পড়েছি। এই বাস্তবতায় নবীনদের নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে এবং মুক্ত বুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।" তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দীর্ঘ ২৪ বছর পরও অবাস্তবায়িত থাকার কথা উল্লেখ করে অধিকার আদায়ে তরুণ সমাজকে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের প্রধান অনির্বাণ বড়ুয়া বলেন, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে পড়ালেখায় মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তির সঠিক ও ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন থাকার ওপরও জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এইচডাব্লিউএফ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি কবিতা চাকমা এবং পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুনীতি বিকাশ চাকমা। বক্তারা জুম্ম শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত থেকে শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

আলোচনা ও সংবর্ধনা পর্ব শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের জুম্ম শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

চবিতে পিসিপি'র উদ্যোগে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

"জুম পাহাড়ের নবীন প্রাণ, শেকড়ের তরে শিক্ষাই হোক মোদের মুক্তির গান" স্লোগানে কেন্দ্র করে ২৪ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীন, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুমন মারমা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড়ি এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি গৈরিকা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বরণমাল্য পাঠ করেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী লিলি পাংখোয়া এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রীতি স্মারক পাঠ করেন পালি বিভাগের শিক্ষার্থী শ্রেয়া তালুকদার।

প্রধান অতিথি উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীনের কাছ থেকে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মানপত্র গ্রহণ করেন মনিষা তঞ্চঙ্গ্যা এবং ফুল ও বিদায়ী স্মারক গ্রহণ করেন একই শিক্ষাবর্ষের উসাহ্লা মারমা। অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমার কাছ থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মানপত্র গ্রহণ করেন বিপুল তঞ্চঙ্গ্যা এবং ফুল ও সংবর্ধনা স্মারক গ্রহণ করেন একই শিক্ষাবর্ষের কনক চাকমা। এছাড়াও অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমার কাছ থেকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মানপত্র গ্রহণ করেন



লাল জুঁই লুসাই এবং ফুল ও সংবর্ধনা স্মারক গ্রহণ করেন একই শিক্ষাবর্ষের দর্শনা চাকমা।

এই সময় ড. মোহাম্মদ আল-আমীন মহোদয় বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর অগ্রসর শিক্ষিত অংশ। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাজ, জাতি তথা দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম। জানার জন্য পড়তে হবে, নিজেকে আলোকিত করতে হবে। অর্জিত শিক্ষা সমাজের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আগামীতেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, পড়াশোনায় মনযোগী হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক মান এগিয়ে নিতে হবে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের গবেষণার দিকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত শিক্ষা ও মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আগত জীবন ও সমাজের জন্য অবদান রাখার জন্য চেষ্টা রাখতে হবে। আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় যেন তাদের দায়িত্ববোধকে ভুলে না যায়।

সুমন মারমা বলেন, প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সেই শিক্ষাকে জাতি ও সমাজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করা। পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুক্ত নয়। ১৯৯৭ সালের জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এখনো অবাস্তবায়িত রাখা হয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়নি। চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন হলে পাহাড়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বহুগুণে সমাধান হতো।

অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, পাহাড়ের পূর্বের তুলনায় বহুগুণে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আমাদের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। সমতল থেকে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্যাম্পাসের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার স্রোত থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। সকলে মিলে আমরা যেন এই ক্যাম্পাসে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের ভিত্তি রচনা করতে পারি। সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণকে সবার আগে প্রাধান্য দিতে হবে।

এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রিয় জ্যোতি চাকমা (রিবেক)-এর সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি এনতেস চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিশন চাকমা এবং সর্বশেষ আলোচনা সভা শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দ ও রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ও অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।



পিসিপি'র উদ্যোগে ঢাকা মহানগর শাখার নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত



গত ২৪ জুলাই ২০২৬ বিকাল ৩ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত "শেকলে বাধা বন্দী জীবন, বিবর্ণ পাহাড়, অস্তিত্ব রক্ষাই হোক নবীনের দৃপ্ত অঙ্গীকার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢাকায় বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫ -২০২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রাশেদা রওনক খান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি জিকো চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক চন্দ্রিকা চাকমা।

এই সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামংচিং মারমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি কনেজ চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পাতলাই ম্রো এবং অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য কলি চাকমা। এছাড়াও নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২৫-২৬ সেশনের নবীন শিক্ষার্থী উটিংটিং মারমা।

অনুষ্ঠানের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষাজীবনে গবেষণার পাশাপাশি সেখানকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানার সুযোগ হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের জীবন পরিচালনা করে। সেই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা যে সংগ্রাম করে এগিয়ে আসছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত তিন দফা দাবির বিষয়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ড. রাশেদা রওনক খান বলেন, রাষ্ট্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে যে বৈষম্য ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে রেখেছে, একদিন তারা অবশ্যই সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অনেক পাহাড়ি শিক্ষার্থী মাতৃভাষা ভিন্ন হওয়ায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা



উচ্চারণে শুরুতে কিছুটা সমস্যার মুখোমুখি হয়। তবে এ নিয়ে হতাশ না হয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে।

জিকো চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রূঢ় বাস্তবতা পেরিয়ে যেসকল নবীন শিক্ষার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদের হৃদয়ে শেকড়ের প্রতি নাড়ির টান ধারণ করতে হবে। অধ্যয়ন শেষে সুশিক্ষিত এবং সুনাগরিক হয়ে শিকড়ে ফিরে সমাজ পরিবর্তনে এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র সমাজকে দৃপ্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

ত্রিজিনাদ চাকমা বলেন, আমাদের পূর্বসূরীদের দীর্ঘ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা রাজধানী ঢাকার বুকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছি। দীর্ঘ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস আমদের জানতে হবে। এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে অর্জিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে তরুণ ছাত্রসমাজকে ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের (প্রশাসন) উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামংচিং মারমা নিম্ন-লিখিত দাবি উত্থাপন করা হয়: ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী সেন্টার প্রতিষ্ঠা; এবং ২. ভাষা বিজ্ঞান বিভাগে আদিবাসী ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা।

পরবর্তীতে আলোচনা পর্ব শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপির রোয়াংছড়ি থানা শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

"সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩০ জুলাই ২০২৬ রোয়াংছড়ি টাউন হলে পিসিপির রোয়াংছড়ি থানা শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অংশৈ মং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক



অন্তর চাকমা, পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা প্রমুখ।

এই সময় অংশৈ মং মারমা বলেন, দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি এবং বর্তমান বিএনপি সরকার আসতে না আসতে চুক্তি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। এখানকার অঞ্চল সেনা ছাউনিতে ঘেরা, কিন্তু দেশের অন্যান্য জায়গায় কয়টি আর্মি ক্যাম্প দেখা যায়? অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় অগণিত ক্যাম্প রয়েছে। সামান্য রোয়াংছড়ি উপজেলাতেও প্রত্যক জায়গায় সেনা ক্যাম্প রয়েছে। প্রতিনিয়ত এখানকার মানুষ হয়রানি শিকার হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এইসব শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তরুণদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

অন্তর চাকমা বলেন, এই পাহাড়ের ইতিহাস শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদে শোষণ বঞ্চনার কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইসলামী সম্প্রসারণবাদের শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের দুর্দশার কথা কর্ণপাত করেনি। তারই বিপরীতে জুম্ম জনগণ এম এন লারমার নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অধিকারের আদায়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছে। যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী ১৯৯৭ সালে জুম্ম জনগণের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আজ ২৯টি বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও কোনো সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রণী ভূমিকা রাখেনি। প্রতিনিয়ত এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে নানাভাবে নিপীড়ন নির্যাতন করা হচ্ছে।

পরবর্তীতে কাউন্সিল অধিবেশনে মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, চসিংথোয়াই মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং অংসাপ্রু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রোয়াংছড়ি থানা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এই সময় নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো।

সম্মেলনে রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি হ্লামংচিং মারমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অংশৈ সাই মারমা।



বান্দরবানে হামে আক্রান্ত রোগীদের দেখতে হাসপাতালে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দল



গত ২ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯ টার দিকে বান্দরবানে হামে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের দেখতে বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে গিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিনিধি দল।

জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মেঞোচিং মারমা এই দলের নেতৃত্ব দেন। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন থোয়াইক্যজাই চাক, থুইমংপ্রু মারমা, যীরমিয় ত্রিপুরা, তিংক্য খুমী, রেংয়ং ম্রো, ফিলিপ খিয়াং, সুশীল বিকাশ চাকমা ও মংশৈ কার্বারী।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রতিনিধি দল হাসপাতালে পৌঁছে একে একে রোগীদের স্বাস্থ্য চিকিৎসার খোঁজ নেন। রোগীদের নানা সমস্যা এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার নানা ঘাটতির দিকগুলি আলোচনায় উঠে আসে।

রোগীদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ নেয়ার পর প্রতিনিধি দলটি জেলা সিভিল সার্জন ডা: মোহাম্মদ শাহীন হোসাইন এর সাথে রোগীদের নানা সমস্যা বিষয়ে কথা বলেন। এসময় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: তৌহিদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য (স্বাস্থ্য বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডা: সানাইপ্রু ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দলটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়। হাম রোগীদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় সকল ধরনের সহযোগিতা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। হাম রোগীদের অভিভাবকদের বিনামূল্যে খাবার প্রদান করারও পরামর্শ দেয়া হয়।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে টিকা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সময়মত টিকা প্রদান সুনিশ্চিত করারও কথা বলে প্রতিনিধি দলটি। পাশাপাশি বান্দরবান সদর হাসপাতালে নির্মিত নতুন ভবন দ্রুত চালু করার পরামর্শ দেয়া হয়। রোগীরা বিরক্ত হয় এমন পরিস্থিতি এড়াতে সেদিকে নজর দিতে বলা হয়। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিতে পারে বলেও প্রতিনিধি দলটি মন্তব্য করে।

উল্লেখ্য, বান্দরবানে ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাবের পর চলতি বছরে মার্চ মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন হামে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে রুমা থেকে ৯ শিশু এবং আলীকদমে ১৩ জন হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আক্রান্ত হওয়া অধিকাংশ অঞ্চল দুর্গম এবং সেখানে ম্রো ও খুমী জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। এছাড়াও কিছু খিয়াং, বম, ত্রিপুরা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীরও রয়েছে।



থানচিতে পিসিপির ১২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত



“সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন”– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বান্দরবানের থানচিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) ১২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৪ আগস্ট ২০২৬, মঙ্গলবার থানচির হিউম্যানিটারিয়ান হলে থানচি থানা শাখার আয়োজনে এ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

থানা শাখার সভাপতি সিংওয়াইমং মারমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক উমংহ্লা মারমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক উশৈসিং মারমা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি থানচি থানা কমিটির সভাপতি চসাথোয়াই মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রেংইয়ং ম্রো এবং পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডিসন চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চসাথোয়াই মারমা বলেন, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ঘর ও মাটি প্রয়োজন। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড়ের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। এম এন লারমার চেতনাকে ধারণ করে অধিকার আদায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রেংইয়ং ম্রো পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং চুক্তি লঙ্ঘনের নানা চিত্র তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, চুক্তির ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পাহাড়ি মন্ত্রী থাকার কথা থাকলেও একজন বাঙালি প্রতিমন্ত্রীকে দিয়ে মন্ত্রণালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ে জুম্মদের উচ্ছেদ, অবৈধ সেটেলার অনুপ্রবেশ এবং অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন এবং এ সবের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানান।

অপর বিশেষ অতিথি এডিসন চাকমা বলেন, পাহাড়ে উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল, মিথ্যা মামলা এবং সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। জুম্মদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে ছাত্র সমাজকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিংওয়াইমং মারমাকে সভাপতি, উমংহ্লা মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং ক্যসাইনু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি থানচি থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা।

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে ৭টি বিদ্যালয়ে পিসিপির সাংগঠনিক সফর ও মতবিনিময়



পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের ৭টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক সাংগঠনিক সফর ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সফরকালে উদ্দিপন চাকমার নেতৃত্বে পিসিপির প্রতিনিধি দলটি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকবৃন্দের সাথে সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থার নতুন কারিকুলাম, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মতবিনিময় শেষে পিসিপির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকদের হাতে ‘মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মারক সংকলন-২০২৫’-এর সৌজন্য কপি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমসাময়িক নানা পরিস্থিতি এবং জীবনমুখী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা



হয়। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার, মোবাইল গেম ও অনলাইন জুয়ার ক্ষতিকর প্রভাব, এবং মদ, গাঁজা ও ইয়াবাসহ মাদকাসক্তির মারাত্মক পরিণতি তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে কেবল পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান অর্জনই নয়, বরং নিজেদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠার পরামর্শ দেয়া হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট থেকে ১০ আগস্টের মধ্যে তিনটি ধাপে এই সফর কার্যক্রম পরিচালিত হয়: ১. ৪ আগস্ট ২০২৬, দক্ষিণ পাবলাখালি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, খেদারমারা উচ্চ বিদ্যালয় এবং উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়; ২. ৯ আগস্ট ২০২৬, উগলছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়; এবং ৩. ১০ আগস্ট ২০২৬, মেদিনীপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সারোয়াতুলি উচ্চ বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় ও শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক এই উদ্যোগ স্থানীয় শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে প্রশংসিত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

তংপ্রু পাড়ায় যুবসমাজের সঙ্গে পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার মতবিনিময়



পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে তংপ্রু পাড়ার স্থানীয় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, যুব সমাজের ভূমিকা, নারী অধিকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গত ১১ আগস্ট ২০২৬ বিকেলে বান্দরবান সদর উপজেলার জামছড়ি ইউনিয়নে উক্ত মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে তংপ্রু পাড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে স্থানীয় যুবসমাজকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

আলোচনায় যুবসমাজকে নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে তা মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। একজন সচেতন যুবকের জাতীয় ও জন্মভূমির প্রতি দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে যুবদের ভূমিকা এবং সাংগঠনিক ঐক্যের গুরুত্ব নিয়ে বিষদ আলোচনা হয়। অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পার্বত্য এলাকার আন্দোলন-সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও সভায় তুলে ধরা হয়।

এছাড়া, নারী সমাজকে আরও অধিকার সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে পাহাড়ের মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক উবাথোয়াই মারমা, বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জেকিপ্রু মারমা, তংপ্রু পাড়ার যুব নেতৃবৃন্দ এবং বান্দরবান জেলা শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাঘাইছড়ির শিজকে পিসিপির মতবিনিময় সভা: শিক্ষার মানোন্নয়ন ও মাদক নিয়ন্ত্রণে ৬ দফা সিদ্ধান্ত

রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ির শিজকে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্র-যুবসমাজকে অপসংস্কৃতি ও মাদক থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম



পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে উপজেলার শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিবরন চাকমার সভাপতিত্বে এবং সহ-সভাপতি উদ্দীপন চাকমার সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সাবেক সদস্য উৎপলাক্ষ চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা, সারোয়াতুলি ইউনিয়নের সম্মানিত ইউপি চেয়ারম্যান অতুলবিহারী চাকমা, শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাগরচাঁন চাকমা ও সারোয়াতুলি মৌজার কার্বারি সুকর্ন চাকমা প্রমূখ। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন পিসিপি শিজক কলেজ শাখার সভাপতি জগৎ আলো চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উৎপলাক্ষ চাকমা বলেন, "এবারের এসএসসি পরীক্ষায় রাঙামাটি জেলার মধ্যে বাঘাইছড়ি উপজেলায় পাসের হার সবচেয়ে কম, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও হতাশার বিষয়। এর দায় উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিস এড়াতে পারে না। দীর্ঘদিনের নজরদারির অভাব, পাহাড়ি অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষক-অভিভাবকদের দায়িত্বশীলতার ঘাটতিই এই পতনের কারণ। তাই এই ফলাফলকে কেবল একটি পরীক্ষার ফল হিসেবে না দেখে, বাঘাইছড়ির সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।"

পাশাপাশি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের 'আদিবাসী নেই' এমন বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, "বিএনপি নির্বাচনের আগে 'রেইনবো নেশন' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন দেশের ৫০টিরও বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণা করছে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সারোয়াতুলি ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান অতুলবিহারী চাকমা বাঘাইছড়িকে 'মাদক সাম্রাজ্য' উল্লেখ করে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শিক্ষক, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান-কার্বারি, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা সতর্ক করে বলেন, "বর্তমান ছাত্র ও যুব সমাজ হচ্ছে আমাদের জাতির ও সমাজের মেরুদণ্ড। তারা যদি মোবাইল গেম, মাদক ও অপরাধে জড়ালে জাতীয় অগ্রগতি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। আমরা আরও অনেক পিছিয়ে যাবো। তাই এখন থেকে ছাত্র-যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। তাদের সঠিক দিশা দেখাতে হবে।"

অন্যদিকে, শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাগরচাঁন চাকমা ফলাফলের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বলেন, এবার আমাদের শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের হার অন্যান্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক কম হয়েছে। আমি মনে করি, এর দায়ভার আমারও রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগগুলো ঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় এমনটা হয়েছে। তবে আগামীতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে এক মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। শিজক কলেজ ও শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন দোকানে ১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে মাদক কেনাবেচা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে; ২। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান নিশ্চিত করা; ৩। বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠ, আগর বাগান ও আশপাশের এলাকায় অহেতুক আড্ডা, মাদক সেবন, মোবাইল গেম ও অনলাইন জুয়া খেলা থেকে বিরত থাকা; ৪। সন্তানদের পড়াশোনা ও উপস্থিতির খোঁজখবর নিতে অভিভাবকদের সপ্তাহে অন্তত একদিন শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা; ৫। এসএসসি-তে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিক আচরণ করা এবং তাদের হতাশা কাটিয়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পৃথক কাউন্সেলিং, উৎসাহ ও উপদেশমূলক পরামর্শ প্রদান করা; এবং ৬। স্কুল পালানো শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া এবং সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।



মুক্ত আলোচনা শেষে সভাপতি চিবরন চাকমার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। সভায় এলাকার হেডম্যান-কার্বারি, স্থানীয় মুরুব্বি ও বিদ্যালয়সংলগ্ন ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে বাঘাইছড়িতে পিসিপি'র মতবিনিময় সভা



পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে উপজেলার বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের বাঘাইছড়ি গ্রামের যুব সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ আগস্ট ২০২৬, আনুমানিক ২ টার দিকে উগলছড়ি মুখ (বটতলা) গ্রামে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় জুম্মদের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি, রক্ষণশীল সামাজিক নেতৃত্বের ভূমিকা, ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তি ও অনলাইন জুয়া এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিদ্যমান এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে তরুণ ও যুবসমাজের করণীয় এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি উদ্দীপন চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রুপেজ চাকমা।

সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা সামাজিক অবক্ষয় রোধে তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রান্তিক আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে: রঁদেভূ'র ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে চবি উপ-উপাচার্য

গত ১৮ আগস্ট ২০২৬ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় "ঐতিহ্যের আলোয় এক দশক; শেকড়ের টানে, সংস্কৃতির জয়গানে" স্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী'র ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল-আমীন এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান উপদেষ্টা, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাঞ্চন চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)-এর সভাপতি শিশির চাকমা, চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রাইটার্স ইউনিয়নের সভাপতি মংক্য শোয়েনু নেভী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড়ী এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি গৈরিকা চাকমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জাল্লাং এনরিকো কুবি ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শ্রেয়া তালুকদার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যাপরিও চাকমা এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা।

অনুষ্ঠানে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)-এর সভাপতি শিশির চাকমাকে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল-আমীন বলেন, রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী শিল্পসত্তা নিয়ে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে বৈচিত্র্যময়তাকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে রঁদেভূকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের মধ্যেও অধিকতর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। আদিবাসীদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের এক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

উদ্বোধক প্রফেসর ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের সাথে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। রঁদেভূ এক দশকের পথচলা



আদিবাসী জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং আগামী দিনগুলোতে আরও অধিকতর সক্রিয় হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

শিশির চাকমা বলেন, আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রঁদেভূ যে অবদান রেখে যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্রিটিশ শাসন থেকে পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের সময়কাল পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়ে আসা আদিবাসী জনগণের অধিকারহীনতা এবং সংস্কৃতিগত আগ্রাসন এই জাতিগুলোকে অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এই বাস্তবতায় রঁদেভূকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কণ্ঠকে মূলধারায় নিয়ে আসতে অধিকতর কাজ করতে হবে।

মংক্য শোয়েনু নেভী বলেন, আমার সামাজিক জীবনের প্রারম্ভ রঁদেভূর মতো প্লাটফর্ম থেকে বিকশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার উর্বর ক্ষেত্র সেটা ধীরে ধীরে সাংগঠনিক রূপ ধারণ করেছে। বিশ্বের দেশে দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির প্রকাশের ক্ষেত্রকেও বিকাশের পথে এগিয়ে নিতে তাড়িত করেছে। রঁদেভূ শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকা নয়, গোটা দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিসরেও তার কার্যক্রমকে বিকশিত করবে। বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মিলনক্ষেত্র তৈরি করবে। আদিবাসীদের চিন্তা, চেতনা ও উত্তরাধিকার জ্ঞানকে আরো প্রস্ফুটিত করবে।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি জাল্লাং এনরিকো কুবির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে এবং পরবর্তীতে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাঘাইছড়ির উলুছড়িতে পিসিপি'র সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত



রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের উলুছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিপিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ আগস্ট ২০২৬, উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিবরন চাকমার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু বিকাশ চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খেদারমারা ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান ও সদ্য গঠিত রাঙামাটি জেলা



পরিষদের সম্মানিত সদস্য বিল্টু চাকমা, উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক সুরেশ বিহারী চাকমা, স্থানীয় মেম্বার পারিয়ন চাকমা ও উলুছড়ি মৌজা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি প্রবীর মিত্র চাকমা প্রমূখ।

সভা শেষভাগে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এক মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় ২টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। খেদারমারা ইউনিয়নের বিদ্যালয়সংলগ্ন দোকানগুলোতে ১৮ বছরের কম বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে মাদক কেনাবেচা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা; ২। উলুছড়ি গ্রাম সংলগ্ন বাঁধ ও নলবনিয়া ব্রিজ এলাকায় সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা পর অহেতুক আড্ডা, মাদক সেবন, মোবাইল গেম ও অনলাইন জুয়া খেলা থেকে বিরত রাখা।

মুক্ত আলোচনা শেষে সভাপতি চিবরন চাকমার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। আলোচনা সভায় সঞ্চালনা ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি উদ্দীপন চাকমা।

বাঘাইছড়ির সাজেকে বর্গা শিক্ষক দিয়ে চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিসিপির সরেজমিন পরিদর্শন



রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ছয়নালছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত শিক্ষক উপস্থিতি এবং বর্গা (প্রক্সি) শিক্ষক দিয়ে পাঠদান পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৮ আগস্ট ২০২৬, পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি উদ্দীপন চাকমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে গেলে এসব অনিয়ম ও তীব্র অবকাঠামো সংকটের চিত্র সামনে আসে।

রুমে গাদাগাদি করে বসা শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন জয়ন্ত চাকমা ও নির্মল চাকমা নামের স্থানীয় দু'জন জুম্ম গ্রামবাসী।

তাঁরা জানন, বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সংকট হওয়াতে প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের একরুমে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের যৌথভাবে এক রুমে বসিয়ে ক্লাস করতে হয় তাদের।

অন্যদিকে, প্রতিনিধি দলটি বিদ্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনুপস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে জানানো হয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ চাকমা অফিসিয়াল কাজে বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে অবস্থান করছেন। তবে অন্যান্য শিক্ষকদের অনুপস্থিতির বিষয়ে তারা কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

অবশ্য পরে স্থানীয়দের থেকে পিসিপির প্রতিনিধি দলটি জানতে পারে, অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকা শিক্ষকরা এখনো নিজেদের প্রাপ্ত বেতন থেকে নামমাত্র সম্মানীর বিনিময়ে স্থানীয় বর্গা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

ফলে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, সাজেকের ছয়নালছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বাঘাইছড়ি উপজেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার অনিয়মের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছিল। বিশেষ করে, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থেকে বর্গা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বিষয়টি সরেজমিনে যাচাইয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার একটি প্রতিনিধি দল ছয়নালছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে।

রোয়াংছড়িতে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পিসিপি'র বনভোজন ও মতবিনিময় সভা

বান্দরবান জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) রোয়াংছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে রোয়াংছড়িতে অবস্থানরত স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক বনভোজন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ আগস্ট ২০২৬ শুক্রবার উক্ত বনভোজন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।



উক্ত বনভোজন ও মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি সিংওয়াই মং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য উক্যমং মারমা ও বান্দরবান বুনোফুল বিতর্ক ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ক্যহিন মারমা। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চসিং থোয়াই মারমার সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক অংসাপ্রু মারমা।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় ছাত্র ও যুব সমাজের ভূমিকা ও করণীয় তুলে ধরেন। তারা আরও অভিযোগ করেন, শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ের ছাত্র ও যুব সমাজকে রাজনীতিবিমুখ করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও সুযোগ-সুবিধার ফাঁদ তৈরি করছে। এসব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তারা।

একই সাথে জুম্ম জনগণের মুক্তির সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

অবশেষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে দিনব্যাপী এই বনভোজন ও মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাদক প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বরকলে পিসিপি'র মতবিনিময় সভা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) বরকল থানা শাখার উদ্যোগে বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজ ও কিয়াং পাড়া এলাকার শিক্ষার্থীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ আগস্ট ২০২৬, শুক্রবার উক্ত মতবিনিময়



সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি'র বরকল থানা শাখার সভাপতি ইলেন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক রিন্টু চাকমা। মতবিনিময় সভায় মূল বক্তা ও আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র বরকল থানা শাখার সহ-সভাপতি পলু মারমা এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক জিতেশ চাকমা।

সভায় বিশেষ সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নমনিতা চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক মেঘলা চাকমাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা শিক্ষার মানোন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীরা তাঁদের নানা সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মারিশ্যার তুলাবান এলাকায় স্থানীয় ধর্মগুরু, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পিসিপি'র মতবিনিময়



রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা ইউনিয়নের তুলাবান এলাকায় স্থানীয় ধর্মীয় গুরু, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র



পরিষদ (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার নেতৃত্বে এক সচেতনামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ আগস্ট ২০২৬, শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে তুলাবান নবরত্ন বৌদ্ধ বিহারে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি উদ্দীপন চাকমার সঞ্চালনায় এবং সংগঠনের সভাপতি চিবরন চাকমার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা।

এছাড়া সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তুলাবান নবরত্ন বৌদ্ধ বিহারের সম্মানিত বিহারাধ্যক্ষ আর্য্যকীর্তি মহাথের ভিক্ষু, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য ও বর্তমান জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য জ্যোতিষ্মান চাকমা, মারিশ্যা ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান আপন চাকমা, তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জ্ঞান রঞ্জন চাকমা প্রমূখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে একসময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মাদকাসক্ত করে তাদের সম্পত্তি লুটপাট চালিয়েছিল। আজকে একই বাস্তবতা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজকে শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে আমাদের মূল্যবান সম্পদ, আমাদের মূল্যবান ভবিষ্যৎ, আমাদের আগামী প্রজন্মকে মাদকাসক্ত করে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বিহারাধ্যক্ষ আর্য্যকীর্তি ভিক্ষু বলেন, একটি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ নিহিত থাকে পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে। যিনি প্রকৃত বৌদ্ধ, তিনি পঞ্চশীলের ৫টি নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে। এবং সেই নিয়মগুলো অনুসরণ করলে তার উপর আর কোন অজ্ঞানতা ভর করতে পারে না। তিনি নিজের এবং অপরের ক্ষতি হয় এমন কোন কর্ম করা থেকে সর্বদা বিরত থাকেন।

চেয়ারম্যান আপন চাকমা স্থানীয় যুব সমাজের প্রতি আহ্বান রেখে বলেন, একমাত্র যুব সমাজই পারে আমাদের সমাজ ও জাতির বিকাশের ধারাকে সচল ও গতিশীল রাখতে। তাই আসুন, সমাজের এসব অসঙ্গতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে যা যা করণীয়, সেসব বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং সেই পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ হাতে নিই।

জ্ঞানরঞ্জন চাকমা বলেন, আমাদের সমাজব্যবস্থায় যুব সমাজের দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদেরকে ডেডিকেটেড হতে হবে। কোনো ধরনের পিছুটান, ভয়-ভীতি বা দ্বিধা রাখা চলবে না। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা নির্ভয়ে ও দৃঢ়তার সঙ্গে করে যেতে হবে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আপস করা যাবে না।

জ্যোতিষ্মান চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনেকেই আজ যেন ভুলে গেছেন। মাঝেমধ্যে আমাদেরই তাদের সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়–এটি মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। যে চুক্তিকে ঘিরে এত আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, এত রক্ত ঝরেছে, সেই চুক্তিকে আজ অবমূল্যায়ন করে অকেজো করে রাখা হয়েছে। এর পরিণতির জন্য রাষ্ট্রকে যেকোনো সময় চরম মাশুল দিতে হতে পারে বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

পরবর্তীতে সভার সভাপতি চিবরন চাকমার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে মতবিনিময় সভাটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রুপেশ চাকমা।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজকে শরিক হওয়ার আহ্বান: পিসিপি'র লামা থানা শাখার ৮ম সম্মেলন



"সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান লামা থানা শাখার ৮ম সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৩:০০ ঘটিকায় উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে পিসিপির লামা থানা শাখার সভাপতি মংক্যএ মারমার সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মংএনু মারমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা শাখার অর্থ সম্পাদক জিসান মারমা। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির



লামা থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি সাহ্লাউ খেয়াং প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসাম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আজও জুম্ম জনগণ কঠিন অনিশ্চয়তা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরও সরকার তা বাস্তবায়ন না করে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। লক্ষ্য পূরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে হাতিয়ার উল্লেখ করে তিনি জুম্ম জনগণ তথা অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রাম তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে পার্টির বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা বলেন, উন্নয়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। লামাতে রাবার প্ল্যান্টেশন ও বিভিন্ন কোম্পানির নামে শত শত একর ভূমি অবৈধভাবে দখল করে নেওয়া হয়েছে। যে ভূমিকে আমরা যুগ যুগ ধরে আগলে রেখেছি সেই ভূমি তারা এখন অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। একদিকে শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যেদিকে যায় উপজাতীয় মুসলিম পাড়া নামে সাইনবোর্ড লাগানো গ্রাম দেখা যায়। অন্যদিকে সচেতনতার অভাবে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে।

সাহ্লাউ খেয়াং বলেন, বর্তমানে দেখা যায় ছাত্র সমাজ অধিকাংশই রাজনীতি বিমুখ ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়। কিন্তু, জুম্ম জনগণের অধিকার পেতে হলে আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও অধিকার সচেতন হওয়া আবশ্যক। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাথে যুক্ত হতে চায় তাদেরকে বিভিন্ন হামলা, মামলা, গুম, হত্যা করার প্রবণতা দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভয়ের সংস্কৃতিকে জিইয়ে রেখেছে। এই ভয় কাটিয়ে উঠে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এযাবৎকাল ধরে জুম্ম জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণে লড়াই সংগ্রাম করে আসছে, এখনো সেই লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মংক্যএ মারমাকে সভাপতি, মংএনু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং মংখ্যাসিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি'র লামা থানা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক উশৈহ্লা মারমা।

বরকলে মহিলা সমিতির থানা কমিটির ৬ষ্ঠ কাউন্সিল সম্পন্ন



সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাতদৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বরকল থানা কমিটির ৬ষ্ঠ কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট ২০২৬, অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে আগামী কার্যকালের জন্য ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সুচরিতা চাকমা, সভাপতি, সুচরিতা চাকমা (অমিতের মা) সাধারণ সম্পাদক এবং বিউটি দেওয়ান সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিতা চাকমা।

বরকল থানা কমিটির সভাপতি শকুন্তলা চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সুচরিতা চাকমার সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মনি চাকমা।

এছাড়াও প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির স্টাফ সদস্য বিধান চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫নং বড় হরিণা ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলাময় চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য মানবিকা দেওয়ান, আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাংগামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিতা চাকমা, বরকলের কার্বারি এসোসিয়েশনের সভাপতি নন্দ বিকাশ চাকমা।



প্রধান অতিথির বক্তব্যে মনি চাকমা সমাজ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে সাথে নিয়ে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ভূমি বেদখল ও নারীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান আলোচক বিধান চাকমা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অনুপ্রেরণায় ১৯৭৫ সালে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করেন। তিনি পার্বত্য চুক্তির আলোকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার না হওয়া এবং চুক্তি মোতাবেক মন্ত্রী হবেন অবাঙালি কিন্তু বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মীর হেলালকে প্রতিমন্ত্রী করায় সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চুক্তি লঙ্ঘনের সমালোচনা করেন।

রিনা চাকমা জুম্ম নারীদের অধিকার আদায়ে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তীয় সমাজব্যবস্থা ভেঙে আন্দোলনে বেগবান করার আহ্বান জানান।

মানবিকা দেওয়ান প্রগতিশীল সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাগুলো বাস্তবায়নে জোর দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন।

নন্দ বিকাশ চাকমা নারী সমাজকে সংগঠিত করে পার্টির সাথে আন্দোলনে সামিল হওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক ও অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিতে নবগঠিত কমিটিকে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এযাবৎকালে লড়াই-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী ও পঙ্গুত্ববরণকারীদের স্মরণে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিদায়ী সভাপতি শকুন্তলা চাকমা সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে নতুন কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সম্মেলনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বরকল থানা শাখার নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

মাদক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে বিহারপুরে ছাত্র-যুব সমাজের সাথে মতবিনিময়

রাঙ্গামাটি জেলা সদরের বিহারপুর এলাকায় স্থানীয় ছাত্র-যুব সমাজের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের (এইচডব্লিউএফ) যৌথ নেতৃত্বে এক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট ২০২৬, উক্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।



সভায় বিহারপুর এলাকার সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ও ছাত্র-যুব সমাজের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা আলোকপাত করে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় পিসিপি-র শহর ও জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি সদর থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় বিহারপুর এলাকার বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ছাত্র ও যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে অধিকতর সামিল হতে হবে: পিসিপির কাউখালী শাখা সম্মেলনে বক্তারা



“সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন”– এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর কাউখালী থানা শাখার ১৯তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬ সম্পন্ন হয়।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাউখালী থানা কমিটির সভাপতি হ্লাচিমং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির কাউখালী থানা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নিপুন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনের সূচনালগ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কাউখালী থানা শাখার সহ-সভাপতি রসিক তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা শাখার সদস্য সৈকত চাকমা।

প্রধান অতিথি হ্লাচিমং মারমা বলেন, স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যার শিকার হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনেরও অধিক গণহত্যা হয়েছিলো। সেই গণহত্যা গুলোর মধ্যে প্রথম ১৯৮০ সালে ২৫ মার্চ কাউখালীর কমলপতি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিলো। কিভাবে জুম্ম জনগণকে হত্যা করা হয়েছিলো আমরা কখনো ভুলতে পারি না এবং ভুলবো না। তাই শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিপুন চাকমা বলেন, একটি জাতি বা সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন, অন্যদিকে সমাজের নানা প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষের বসবাস। এই সবকিছু ছাত্র-যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য ছাত্র-যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত থেকে সমাজের ছাত্র-যুবকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, শাসকগোষ্ঠী পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক শাসন জারি রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। সেই সেনাক্যাম্পগুলো চুক্তির পর প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও চুক্তির এত বছর পেরিয়ে গেলেও জুম্ম জনগণ এখনো সেনা ছাউনি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীর নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের মাঝে ভয়ের সংস্কৃতি জিইয়ে রাখা হয়েছে।

ম্যাগলিন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস হলো শাসন-শোষণের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও জুম্ম জনগণ সেই শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে রাবার কোম্পানির নামে, উন্নয়নের নামে ভূমি বেদখলসহ জুম্ম জাতি গোষ্ঠীকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।

এলি চাকমা বলেন, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে বাংলাদেশে বিএনপি নতুন সরকার গঠন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আন্তরিকতা জুম্ম জনগণ দেখতে পায়নি। বরং চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বর্তমান সরকার নানা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। চুক্তির এত বছর পরেও মৌলিক বিষয়গুলো সরকার বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের জাতি ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজকে সচেতন থাকতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে আর্য্য চাকমাকে সভাপতি, সৈকত চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুজয় মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কাউখালী থানা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুনীতি বিকাশ চাকমা।

টিঅ্যান্ডটি এলাকায় অবস্থানরত ছাত্র ও যুবকদের সাথে পিসিপি ও যুব সমিতির মতবিনিময়



রাঙ্গামাটি জেলা সদরের রায় বাহাদুর সড়ক (টিঅ্যান্ডটি) এলাকায় অবস্থানরত ছাত্র ও যুবকদের সাথে মতবিনিময় করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সংগঠন দুটির যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উক্ত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।



আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা। এছাড়াও পিসিপির রাঙ্গামাটি শহর শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্থিত বক্তারা, টিঅ্যান্ডটি এলাকায় ক্রমবর্ধমান মাদকের ভয়াবহতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, দূর-দূরান্ত থেকে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে এসে অনেক শিক্ষার্থী মাদকের জালে জড়িয়ে পড়ে পড়াশোনা থেকে ছিটকে পড়ছে। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক পথ থেকে দূরে থাকতে এবং নিজেদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি জোর তাগিদ দেন নেতৃবৃন্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি ও সংকট তুলে ধরে বক্তারা আরও বলেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বেগবান করতে ছাত্র ও যুব সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী দিনের আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

সভায় স্থানীয় এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখা এবং তরুণ সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও শুভেচ্ছা মিছিল



রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস উপলক্ষে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও শুভেচ্ছা মিছিল করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস চলাকালে কলেজ ক্যাম্পাসে একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে এ শুভেচ্ছা মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ক্লাসরুমে গিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সাথে এক সৌজন্য মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে বক্তারা রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের দীর্ঘদিনের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষার্থীদের দাবিসমূহ তুলে ধরেন। বিশেষ করে কলেজে তীব্র শিক্ষক সংকট নিরসন, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাস সংকট দূরীকরণ, অ্যাকাডেমিক পরিবেশ উন্নয়ন এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর আলোচনা করা হয়।

সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দ জানান, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পাহাড়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে তারা সবসময় সোচ্চার থাকবেন। এ সময় নতুন শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়ে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বান্দরবানে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর জেলা কমিটি উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



বান্দরবানে প্রথমবারের মত "গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী"র জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ৯টায় বান্দরবান জেলা সদরের বালাঘাটা এলাকায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর পরপরই শুরু হয় আলোচনা সভা।

সংস্কৃতি কর্মী ক্যহি মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর সহ সভাপতি বাচ্চু চাকমা।



প্রধান অতিথি সুমন মারমা বলেন, আমরা এমন সময়ে বান্দরবানে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর কমিটি গঠন করতে চলেছি যেসময়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চার চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি চর্চার চিত্র বেশি দেখা যায়। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছি আমরা যে দীর্ঘ ৫৫ বছরের ইতিহাসে বান্দরবানে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করতে পেরেছি এবং প্রগিতশীল সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ জোরদার হবে এই প্রত্যাশায়।

সুমন মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন চর্চা করতে হবে। অন্যথায় কোনোকিছুই কাজে আসবে না। শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের উপর সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চাপাচ্ছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তরুণ যুবদের সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বাচ্চু চাকমা বলেন, আমরা বহু সময় ধরে চেষ্টা করে আসছি বান্দরবানে কমিটি গঠন করার। কিন্তু বাস্তবতা ও পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। গিরিসুর শুধুমাত্র সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের সমগ্র জীবনধারা নিয়ে কাজ করার সংগঠন। তিনি আরও বলেন, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটির মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হবে এ কমিটির কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। পরিশেষে তিনি সংগঠনের কাজে সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ নিশ্চিতের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে এক পর্যায়ে ক্যহি মারমাকে সভাপতি, অংসিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং হ্লামে মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর বান্দরবান জেলা শাখার ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এরপর গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর দায়িত্বে আসা নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন জেএসএস, মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং আদিবাসী ফোরামের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে ২৪ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নির্দেশনায় পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত হয় "গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী"।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত

গত ৯ অক্টোবর ২০২৬ পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে চট্টগ্রামস্থ রেশমি কমিউনিটি সেন্টার হলে "আদিবাসী



শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন" শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শরৎ জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরামের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনাবি চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি আদর্শ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা প্রমুখ।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার চাকমা এবং দপ্তর সম্পাদক জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা। উক্ত শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন পতেঙ্গা থানা শাখার সভাপতি জীবন চাকমা।

শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ এবং আদিবাসী মহিলা ফোরামের নেতৃবৃন্দ পাহাড়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং নিজ নিজ শাখা কমিটির সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন।

শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজেরও অংশগ্রহণ আবশ্যক। অধিকারহারা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকার আন্দোলনে শ্রমজীবী পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্ম জনগণের দুই দশকের একটি কষ্টে অর্জিত শ্রম, যেখানে মিশে আছে জুম্ম জনগণের রক্ত আর ঘাম। সেই অধিকারকে ধুলিস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র জুম্ম জনগণ কঠোর হস্তে দমন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের মহান ব্যক্তিদের জীবন দর্শন আমাদের



পাথেয় বিষয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের চিন্তার মধ্যে যে দন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অধিকার আন্দোলনের একটি নতুন পথ সূচিত হবে।

জগৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, ১৯৮০ সালে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান লক্ষ লক্ষ সেটেলার অনুপ্রবেশ করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জটিল থেকে আরও জটিলতর করে তোলে। সেই সমস্যার আজ কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে। অধিকারহারা জুম্ম জনগণের সেই ভাগ্য আজও পরিবর্তন হয়নি। সেই অধিকারহারা জুম্ম জনগণের এবং মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান তিনি।

সোনাবি চাকমা বলেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এই সংগ্রামে পুরুষের যেমন অংশগ্রহণ দরকার, তেমনি প্রয়োজন নারী সমাজের অংশগ্রহণ। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতায় নারী নিপীড়ন, সহিংসতার মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে।

আদর্শ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এক বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যত নির্বাচিত সরকার এসেছে তারা জুম্ম জনগণের জন্য কাজ করার কথা বললেও প্রতিবার জুম্ম জনগণ প্রতারিত হয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রতি পার্বত্য চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ৩টি আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ভূমির বেদখল, ধর্মান্তরকরণ, নির্যাতন-নিপীড়ন, জুম্ম নারী হয়রানি আগের মতই চলমান। তিনি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে অধিকতরভাবে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জোর আহ্বান জানান।

রিবেক চাকমা বলেন, দীর্ঘ দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া এক অধিকারের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের দীর্ঘ সময়ের বৈষম্যের অবসানের কথা থাকলেও চুক্তির পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে সরকার এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই জুম্ম জনগণের অধিকারের চুক্তিকে বানচালের জন্য নানান চেষ্টা চলতে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যাগুলো রাজনৈতিকভাবে সমাধানের কথা থাকলেও সেটি আজও করা হয়নি। দীর্ঘমেয়াদী সেনাশাসনের ফলে জুম্মরা আজ কোণঠাসা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শাখা কমিটির কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় এবং সভাপতির বক্তব্যর মধ্য দিয়ে শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৬ সমাপ্তি ঘটে।

বাঘাইছড়িতে গিরিসুরের আঞ্চলিক শাখা কমিটির শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাংস্কৃতিক সংগঠন গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর বাঘাইছড়ি আঞ্চলিক শাখা কমিটির শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১২ অক্টোবর ২০২৬, সোমবার সকাল ১০ টার দিকে ৩২নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিজ্ঞান্তর তালুকদারের সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য জ্যোতিষ্মান চাকমার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি শ্রীমতী জয়তী চাকমা ইনু।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির স্টাফ সদস্য টয়েন চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী অমর শান্তি চাকমা, মহিলা সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা ও সারোয়াতুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভূপতিরঞ্জন চাকমা প্রমূখ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয়তী চাকমা বলেন, জুম্ম সংস্কৃতির বিকাশ, সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যেই গিরিসুরের জন্ম। গিরিসুরের আত্মিক সম্পর্ক জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ পথপরিক্রমায় গিরিসুর বিভিন্ন প্রতিবাদী ও দেশাত্মবোধক গান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের যাপিত জীবনের অব্যক্ত বেদনা, বঞ্চনা, অধিকারহীনতা ও সংগ্রামের কথাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছে। যেসব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা



কঠিন, সেসব কথাই গিরিসুর তার গান ও শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ফলে গিরিসুরের সাংস্কৃতিক চর্চা কেবল সংগীত পরিবেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা জুম্ম জনগণের ইতিহাস, আত্মপরিচয়, অধিকারচেতনা ও জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

টয়েন চাকমা বলেন, গিরিসুর কেবল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়, এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের এক বারুদকণ্ঠস্বর, শৈল্পিক চেতনা ও প্রতিবাদী সত্তার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। গিরিসুরের গান, সুর ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে মানবতার জয়গান, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের আকাঙ্ক্ষা এবং জুম্ম জনগণের দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপরিচয় রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়। এর শিল্পচর্চা নিছক বিনোদনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিল্পের ভাষায় মানুষের কথা বলা, অধিকারহীন মানুষের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা এবং মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করাই এর অন্যতম তাৎপর্য।

জ্যোতিষ্মান চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণকে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংগ্রামে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জাতীয় চেতনা বিকাশের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর জন্ম। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৪ আগস্ট এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির নামকরণ করেন ইঞ্জিনিয়ার সুশীল চাকমার সহধর্মিণী প্রমীলা তালুকদার। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গিরিসুর গান, সুর ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারণ ও বিকশিত করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

সভাশেষে অমর শান্তি চাকমাকে সভাপতি, দীপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও জুনপহর চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী, বাঘাইছড়ি আঞ্চলিক শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীকে শপথবাক্য পাঠ করান, গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি শ্রীমতী জয়তী চাকমা ইনু। এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিল্পী অমর শান্তি চাকমা।

পিসিপি রাবিপ্রবি শাখার ১ম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৬ অক্টোবর ২০২৬ "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর



সামিল হউন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিসিপি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রাবিপ্রবি)-এর ১ম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য রুমেন চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পিসিপি কেন্দ্রীয় সদস্য সুনীতি বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সদস্য এলি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা।

সম্মেলনে রাবিপ্রবি'র প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সনেট চাকমার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব পহেল চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাবিপ্রবি'র প্রস্তুতি কমিটির সদস্য প্রায়াম খীসা।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এযাবৎকালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি রুমেন চাকমা বলেন, যুগে যুগে যতগুলো জাতি রয়েছে কালের বিভাজনে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে জাতিগুলো লড়াই সংগ্রামে জড়িত ছিল এবং জাতির মুক্তি ও ক্রান্তিলগ্নে জাতির নিজস্ব সংগঠনগুলো এগিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা শুরু থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লড়াই সংগ্রামে এখনো অবিচলিত। আমাদের একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্যবহুল বই অধ্যয়ন করে সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে প্রস্তুত করার তাগিদ দেন।

সুনীতি বিকাশ চাকমা বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে প্রতিবাদের বীজ গজিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বীজকে পরিচর্যা করে আমাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কাজ সেদিন রুদ্ধ হবে যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম



চুক্তি বাস্তবায়ন হবে। আর সেই চুক্তিকে বাস্তবায়ন করতে আমাদের মতো তরুণদের সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এলি চাকমা বলেন, একটি জাতি বা সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য তিনি ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর শাসনের কায়েম অন্যদিকে সমাজের নানা প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষ বসবাস রয়েছে। এই সবকিছু ছাত্র-যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করতে হবে। পড়াশোনা করে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদেরকে সমাজ তথা জাতির স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করা কথা বলেন।

সজল চাকমা বলেন, পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসকগোষ্ঠী সামরিক উপায়ে শাসনের কায়েম জারি রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। যে সেনাক্যাম্পগুলো চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও চুক্তির এত বছর পেরিয়ে গেলেও জুম্ম জনগণ এখনো সেনা ছাউনি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আর এই সেনা শাসন জিয়ে রাখার মূল হোতাদের চিহ্নিত করে প্রতিহত করার জন্য ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কাউন্সিল অধিবেশনে সনেট চাকমাকে সভাপতি, প্রায়াম খীসাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মামুনি চাকমা।

বান্দরবানে পিসিপির ১ম শহর সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন



পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজকে অধিকতর সামিল হওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর বান্দরবান শহর শাখার ১ম সম্মেলন ও কাউন্সিল।

গত ১৭ অক্টোবর ২০২৬, বান্দরবান শহরস্থ মাস্টার গেস্ট হাউজে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উবাথোয়াই মারমাকে সভাপতি, জেহিস্কেল ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক এবং চনুমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে পিসিপি বান্দরবান শহর শাখার ১ম কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এডিসন চাকমা।

কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক উবাথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ফিলিপ খিয়াং-এর সঞ্চালনায় সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য রংথইন ম্রো। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির ছাত্র বিষয়ক সহ সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কাননমালা তঞ্চঙ্গ্যা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য প্রিয় জ্যোতি চাকমা (রিবেক), পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য মেসাই মারমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আত্মাহুতি দানকারী শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

থোয়াইক্যজাই চাক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে বিজাতীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে আসছে। লড়াই-সংগ্রামের এই গৌরবময় পথচলায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পিসিপিকেই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সেনানী হতে হবে।

প্রিয় জ্যোতি চাকমা (রিবেক) বলেন, বান্দরবানে প্রতিনিয়ত ভূমি দখল, পর্যটনের নামে উচ্ছেদ, জুম্ম নারী নির্যাতন ও ইসলামীকরণসহ জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, "সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করতে শেখায়, পক্ষান্তরে প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদ ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা পরিহার করে প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সমবেত হতে হবে।

কাননমালা তঞ্চঙ্গ্যা এবং মেসাই মারমা তাঁদের বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংকট উত্তরণে এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজকেও সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।



এছাড়াও পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা পিসিপির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে বর্তমান বাস্তবতায় সঠিক করণীয় নির্ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে সভাপতি উবাথোয়ই মারমার সমাপণী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

পিসিপি নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার ৯ম সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত



পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার ৯ম সম্মেলন ও কাউন্সিল। গত ২০ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ১০টায় নাইক্ষ্যংছড়ি সদরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন শেষে অংসাই মারমাকে সভাপতি, থোয়াইলেয় মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং উখিংওয়ং চাককে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে নাইক্ষ্যংছড়ি থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক উশৈহ্লা মারমা।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৭৬ নং তরগু মৌজার হেডম্যান ও সাবেক ছাত্রনেতা মংনু মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, নাইক্ষ্যংছড়ি থানা কমিটির সভাপতি প্রুমে মারমা

অংসাই মারমার সভাপতিত্বে ও থোইয়লে মারমার সঞ্চালনায় আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে উখিংওয়ং চাক স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মংনু মারমা একটি শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সমাজ, রাজনীতি ও অধিকার রক্ষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জাতিগত বিভেদ ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমেরিকার আদিবাসীদের ইতিহাসের উদাহরণ টেনে জিকো চাকমা বলেন, নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও ঐক্যের অভাবই আমেরিকার আদিবাসীদের ভূমি ও অস্তিত্ব সংকটে ফেলেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি জুম্ম জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে আমাদের অভিন্ন স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বৈচিত্র্য যেন বিভেদের কারণ না হয়।

প্রুমে মারমা বলেন, জুম্ম নারীদের অধিকার ও আন্দোলনের বিষয়ে জোর দেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নারীদের সচেতনতা, নেতৃত্বের বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা জরুরি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের শেষ পর্বে নবনির্বাচিত সভাপতি অংসাই মারমার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিলাইছড়িতে মহিলা সমিতি বিলাইছড়ি থানা কমিটি ৫ম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত



'সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত দৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করি' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ অক্টোবর কুতুবদিয়া ক্লাব, বিলাইছড়ি প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, বিলাইছড়ি থানা কমিটি ৫ম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সবিনা চাকমা,



সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা, সাবেক জেএসএস জেলা সদস্য টিপু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কাঞ্চনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি নিকেল চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে বিলাইছড়ি থানা বিদায়ী কমিটি অরুনা দেবী সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক উৎপলা চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিকা তঞ্চঙ্গ্যা।

বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করে আসছে। জুম্ম জনগণের অধিকারের সনদ পার্বত্য চুক্তিকে বানচাল করতে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী গোষ্ঠীর নানা ষড়যন্ত্র এখনো বিরাজমান। জুম্ম নারীদের অধিকার সচেতন করার লক্ষ্যে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের জুম্ম নারীদের অধিকার সচেতন করার জন্য মহিলা সমিতির কর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মীদেরকে আরো অধিক আদর্শিক কর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

এই সময় সবিনা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসী এখনো গণতান্ত্রিক শাসন ও নিরাপদ জীবন থেকে বঞ্চিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি বর্তমানে চরম সংকটজনক হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন অনিশ্চিত ও নাজুক পরিস্থিতিতে জুম্ম নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা যেমনি প্রতিনিয়ত ভুলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে, তেমনি তারা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীন জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বোপরি জুম্ম নারীর জাতীয় অস্তিত্ব আজ চরম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

রিনা চাকমা বলেন, জুম্ম নারীরা প্রতিনিয়ত নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হয়। লড়াই সংগ্রামে নিজেকে আত্মবলিদানের মানসিকতা পোষণ করে দৃঢ় শপথ নিতে হবে। তৃণমূল অঞ্চল থেকে জনগণকে সুসংগঠিত করে আমাদের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে গুনগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কাঞ্চনা চাকমা বলেন, পৃথিবীতে যেকোনো বড় মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে হলে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা সম্ভব নয়, যেটি মহান প্রয়াত নেতা এম এন লারমা সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন। জুম্মদের আন্দোলনে নারীদেরও অংশগ্রহণ জরুরি যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির জন্মলাভ। নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আজ সাত মাসের অধিক অতিক্রান্ত হলেও জুম্ম জনগণ সামগ্রিক পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং চুক্তির পরিপন্থী কার্যক্রম আমরা দেখতে পাই।

নিকেল চাকমা বলেন,আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি হচ্ছে জুম্ম নারীরা। কাজেই এই শক্তি যদি সংগ্রামী না হয়, সমাজের যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়, অধিকার সচেতন না হয় তাহলে জুম্ম সমাজের জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারবে না।

অধিবেশন শেষে পুনরায় অরুনাদেবী চাকমাকে সভাপতি, স্বপ্না তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক ও পুরি তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ বাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শিখা চাকমা।

এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার উদ্যোগ, প্রচারপত্র বিতরণ

জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ সোমবার রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাঙ্গামাটি শহর শাখা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচারপত্র বিতরণ ও লেখা আহ্বানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এদিন ভেদভেদি পৌর উচ্চ বিদ্যালয়, মোনঘর স্কুল এন্ড কলেজ এবং রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। প্রচারপত্র বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন হিল



উইমেন্স ফেডারেশন জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সূচনা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি অনন্ত চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক ইমন চাকমাসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও গত ৩০ আগস্ট ২০২৬, রবিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বরকল থানা শাখার উদ্যোগে বরকল মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বরকল থানা শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক জিটেশ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক রিন্টু চাকমাসহ পিসিপি বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজ শাখার নেতৃবৃন্দ।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও এম এন লারমার জীবন-দর্শন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মোট তিনটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে:

ক-বিভাগ (অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি): বিষয় "পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্ম জাতির জীবন ও জীবিকা" (ন্যূনতম ৮০০ শব্দ)।

খ-বিভাগ (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি): বিষয় "জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও এম. এন. লারমা" (ন্যূনতম ১০০০ শব্দ)।

গ-বিভাগ (অনার্স ও মাস্টার্স): বিষয় "মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও দর্শন" (ন্যূনতম ১৫০০ শব্দ)।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রবন্ধ জমা দিতে বলা হয়েছে। লেখা পাঠানোর ইমেইল ঠিকানা: chakmajuwel61@gmail.com, প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ০১৫৭৬৫০২৬৬২ ও ০১৮১০২৭০১১৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতিটি প্রবন্ধের সাথে প্রতিযোগীর নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণি/বর্ষ, মোবাইল নম্বর ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী: বাঘাইছড়িতে পিসিপির প্রচারপত্র বিতরণ ও লেখা আহ্বান



জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাঘাইছড়ির বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রচারপত্র বিতরণ ও লেখা আহ্বান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে পিসিপির বাঘাইছড়ি থানা শাখা।

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বে সারোয়াতুলি, বাঘাইছড়ি ও মারিশ্যা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই প্রচারণা পরিচালিত হয়। একই সঙ্গে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক রুপেশ চাকমার নেতৃত্বে খেদারমারা ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোতে একই কার্যক্রম চালানো হয়।

প্রচারপত্র বিতরণের পাশাপাশি পিসিপির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে সমসাময়িক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তাঁরা শিক্ষার্থীদের মাঝে এম এন লারমার জীবন, রাজনৈতিক আদর্শ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন।

পিসিপির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বাঘাইছড়ির স্থানীয় শিক্ষকরা বলেন, এম এন লারমা এবং জুম্ম জাতীয় জীবন একসূত্রে গাঁথা। তাঁকে বাদ দিয়ে জুম্ম জাতির ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। নতুন প্রজন্মের কাছে এই মহান নেতার আদর্শ ও সংগ্রাম পৌঁছে দিতে উদযাপন কমিটির এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন শিক্ষকেরা।



বান্দরবানে এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত



জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বান্দরবান শহরস্থ মাস্টার গেস্ট হাউজে বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ ঘটিকায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৮৭তম জন্মবার্ষিকী পালন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা।

আয়োজক কমিটির সদস্য এডিশন চাকমার পরিচালনায় বান্দরবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ স্কুল ও কলেজ, কালেক্টরেট স্কুল ও কলেজ, ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয়, বালাঘাটা বিলকিস বেগম উচ্চ বিদ্যালয়, আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগীদের বক্তব্য উপস্থাপনার উপর মান মূল্যায়নের জন্য সাবেক সিভিল সার্জন, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডাঃ মংঊষা থোয়াই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সোহেল হেমব্রম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুমন মারমা বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সুন্দর সমাজ গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা এবং কিশোর অপরাধ দূরীকরণে স্কুল শিক্ষার্থীদের করণীয় প্রসঙ্গে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাহাড়ের জীবন ও সংস্কৃতি এবং তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও করণীয় বিষয়ে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এম এন লারমা জীবন ও দর্শন এবং মাদকাসক্তি দূরীকরণে যুব সমাজের করণীয়ে বিষয়ে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মান মূল্যায়ন নিয়ে পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন বিচারকমণ্ডলী সদস্য ডা: মংঊষা থোয়াই। এছাড়াও ৭ জন প্রবীণ ও ছাত্র কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মেঞোচিং মারমা।

১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এম এন লারমা সকল জাতিসত্তার এক মহানায়ক: বরকলে ৮৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্যামরতন চাকমা



পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বরকল থানা শাখার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্যামরতন চাকমা এই মন্তব্য করেন।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বরকলে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিশান তালুকদারের সঞ্চালনায় এবং সংগঠনটির সভাপতি ইলেন চাকমার সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক জিতেশ চাকমা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাবেক সদস্য ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামরতন চাকমা।

প্রধান অতিথি শ্যামরতন চাকমা বলেন, এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার এক মহানায়ক। তাঁর চেতনার মাধ্যমেই জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াই সূচনা হয়েছিল। তিনি আক্ষেপ করে আরো বলেন, অনেক শিক্ষার্থী মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেও অঞ্চলের প্রাথমিক রাজনৈতিক তথ্য বলতে পারেন না। তিনি তরুণ প্রজন্মকে শুধু এম এন লারমা নয়, তাঁর পরিবারের ত্যাগ ও লড়াইয়ের



ইতিহাস পড়ার পরামর্শ দেন। ১৯৬০ সালে ছাত্রাবস্থাতেই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এম এন লারমার ঐতিহাসিক প্রতিবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জনসংহতি সমিতির মূলনীতির আলোকেই সবাইকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

নিলাময় চাকমা বলেন, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিগোষ্ঠীকে এক সুতোয় বেঁধে জুম্ম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছিলেন এমএন লারমা। তাঁর সততা, নীতি ও আদর্শ চিরস্মরণীয়।

নীরিন্দা চাকমা তার বক্তব্যে জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ে এম এন লারমার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নারী সমাজকে আন্দোলনের অগ্রভাগে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে পিসিপির জিতেশ চাকমা বলেন, এম এন লারমা ছিলেন একজন সত্যিকারের আদর্শিক শিক্ষক। বর্তমান শিক্ষার্থীদের শুধু একাডেমিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নমনিতা চাকমা, বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজ সহ স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

সর্বশেষে সভাপতি ইলেন চাকমার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভাটি শেষ হয়।

বান্দরবানে এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী



গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বান্দরবান জেলা সদরে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি এবং আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব উশৈহ্লা মারমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক উ উইন মং জলি। অন্যান্যদের মধ্যে আরও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সিংমেউ মারমা প্রমুখ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান আলোচক উ উইন মং জলি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশে অসংখ্য রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের কাছে এম এন লারমা প্রাসঙ্গিক। এম এন লারমা কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির অগ্রদূত হলেন? কিভাবে তিনি আমাদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হলেন সেইসব ইতিহাস জানতে হলে এম এন লারমার জীবনী নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। তিনি ভারত, পাকিস্তান ভাগের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বৃটিশদের 'ভাগ করো শাসন করো' পলিসি থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬০ দশকের কাপ্তাই বাঁধের ইতিহাস এবং এম এন লারমার আত্মজীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরে তার আলোচনা শেষ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই মহান নেতা এম এন লারমার প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি বলেন, এম এন লারমাকে অধ্যয়ন করা মানেই কাপ্তাই বাঁধের ইতিহাস সম্পর্কে জানা। বাঁধের ফলে কিভাবে হাজার হাজার একর জমি পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিলো। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভূমিহারা, বাস্তুহারা হয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলো। এই কারণে এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতা প্রাসঙ্গিক। কারণ এম এন লারমা শুধুমাত্র একজন সাংসদ, জাতীয় নেতা এবং আইনজীবী ছিলেন না, তিনি একজন সুবক্তাও ছিলেন। সুমন মারমা বলেন, আমাদের সমাজে সুবক্তা ও অনুপ্রেরণাদানকারী দরকার, কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা অধ্যয়ন না করায় সেটা হয়ে উঠছে না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস জানার পাশাপাশি এম এন লারমাকে জানতে হবে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রোংথইং ম্রো বলেন, আজকে এম এন লারমাকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্ন উঠে আসবে সেটি হচ্ছে তাঁর আদর্শ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংসদ অধিবেশনে তার সেই কাঁপানো ঐতিহাসিক বক্তব্য। তিনি একাই কীভাবে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া



উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিগোষ্ঠীর অধিকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তা কর্ণপাত করেনি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ছাত্র ও যুব সমাজকে মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শকে ধারণ করে অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সিংমেউ মারমা বলেন, মহান নেতা এম এন লারমাকে স্মরণ করা মানেই হলো তার আদর্শকে সম্মান জানানো। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ বর্তমান আধুনিক যুগে এসেও কতটুকু পিছিয়ে পড়া সেটা বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজ ও নারী সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা কেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সেইসব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত করতে হবে। পাহাড়ের বর্তমান নারী সমাজ যাতে রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হয় এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি সেই দাবি ও আহ্বান জানান।

সবশেষে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি ও বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। সভার সভাপতি মেঞোচিং মারমা বলেন, যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন পুরস্কার পাওয়া বড় বিষয় নয়, বরং অংশগ্রহণের মাঝে মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রতিযোগী সকলের সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন সভার সভাপতি মেঞোচিং মারমা।

রাষ্ট্র বাঙালি কর্তৃত্ববাদের জাত্যভিমানী চরিত্রকেই জাহির করছে: ঢাকায় আলোচনা সভায়– পাভেল পার্থ

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঢাকায় বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "জাত্যভিমানী সংবিধানের খেরোখাতায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় 'বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি ২০২৬' এর সদস্য সচিব মনিরা ত্রিপুরার সঞ্চালনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক, গবেষক ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য ফিরোজ আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, গবেষক ও কলামিস্ট ড. মারুফ মল্লিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী ড. ঈশিতা দস্তিদার এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক মেইনথিন প্রমীলা প্রমূখ।

আলোচনায় সভা প্রধান হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি'র আহ্বায়ক লেখক, গবেষক পাভেল পার্থ। তিনি তার উপস্থাপনায় বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন বাংলাদেশের সংবিধানের আলাম (চাকমাদের বুনন শিল্প) এবং বাঙালি ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র বাঙালি কর্তৃত্ববাদের জাত্যভিমানী চরিত্রকেই জাহির করছে।

তিনি বলেন, এম এন লারমার সংবিধান দর্শনে জুম চাষ, কৃষি চাষ, রাজস্ব আদায়, উদপাদন ব্যবস্থায় কৃষি প্রশ্ন, পরিবেশ-প্রতিবেশ দর্শন তথা শোষিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকারকে সন্নিবেশিত করাসহ নারী প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক বহুত্ববাদী রাষ্ট্রেরই ধারকবাহক। যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, পাকিস্তান শাসনামলে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল; বিশাল জনপদ, চাষযোগ্য ভূমি, শস্য ও প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম ধ্বংস হওয়ার যে আগাম বার্তা, তার উদ্ভব, তিনি যে পরিবেশ বা সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন তা থেকে বিকশিত।

ড. আমেনা মহসিন বলেন, সরকারের কাছে পাহাড়িদের যে অস্থির সংকট তৈরি হচ্ছে সেটি ৭২ সালের সংবিধানের সময়ও ছিলো। সেসময় এম এন লারমার যে ভূমিকা সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভিন্ন জাতির হয়ে একাই নিজেদের অধিকারের কথা তুলে ধরেছিলেন। সর্বোপরি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা তুলে এনে তিনি সংবিধানের ত্রুটিগুলো বিশ্লেষণ করেছিলেন। বর্তমান বিএনপির যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে কতটুকু অন্তর্ভুক্তি সম্ভব সেটাও প্রশ্ন থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কতটুকু গণতন্ত্র চর্চা হচ্ছে সেসব বিষয়ও তুলে আনা প্রয়োজন।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির সামরিক এবং আমলাতন্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের বাণিজ্যিক কুঠি। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করছে এবং মুনাফা অর্জন করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর নব্য স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণের এবং সেটেলার পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও প্রতিহিংসা পেরিয়ে সংবিধান দর্শনের



মাধ্যমে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালন করা এম এন লারমার দ্বারাই সম্ভব ছিল। গণপরিষদ বিতর্ক হতে বুঝা যায়, লারমা কার্যত বহুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনে সোচ্চার ছিলেন।

মারুফ মল্লিক বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সংবিধানে চাপিয়ে দেওয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, এটি রাষ্ট্রে বহুত্ববাদী অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। ৭২ সালের সংবিধানের প্রণয়নকালে এম এন লারমার দর্শন বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। ২৪ এর অভ্যুত্থানের পরে নতুন একটা সুযোগ এসেছে পুরনো ভুলগুলো ঠিক করার। বিএনপি সরকার যদি জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে এবং রেইনবো নেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে নতুন কিছু আশা করা যায়, তার ব্যতীত নয়।

ঈশিতা দস্তিদার বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবন এবং অধিকার সম্পর্কিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর সঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন জড়িত যা কোনোভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। এ যুগে পরিবেশ বিপর্যয়ে জনপদগুলো যখন বিপর্যস্ত হচ্ছে তখন লারমার পরিবেশ-প্রতিবেশ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা উঠে আসে। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, লারমার রাজনৈতিক জীবনে দস্তিদার পরিবার খুবই কাছ থেকেই সম্পৃক্ত। ৬০ এর দশকে যখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতি'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার অনতিদূরেই ছিল দস্তিদার বাড়ি।

দীপায়ন খীসা বলেন, বিএনপি এবং তারেক রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্পষ্ট নয় বরং ধোঁয়াশাজনক, তার চাইতে লারমার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শন অধিক স্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক। ২৪ এর গণ-অভ্যুত্থানের পর যে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এম এন লারমা তা ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদে বলেছিলেন। তিনি বলেন, বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি বা রেইনবো নেশন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে ইউটার্ন নিয়ে সামরিক বাহিনী, ডিজিএফআই এবং এনএসআই'য়ের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ক কমিটি গঠন করছে।

মেইনথিন প্রমীলা বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করুক আদিবাসীরা আদিবাসীই। নানা ন্যারেটিভ তৈরির মাধ্যমে আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকারকে ঢামাচাপা দেওয়া হয়। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরও সরকারের দখলদার চরিত্র পরিবর্তিত হয় না। এম এন লারমার সংবিধান দর্শনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য হলেও এম এন লারমার সংবিধান দর্শন পর্যালোচনা করা উচিত।

কাপ্তাইয়ে এম এন লারমার জন্মবার্ষিকী পালন: তার বিপ্লবী চেতনা শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) কাপ্তাই থানা শাখার উদ্যোগে জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি কেতন তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অনন্ত জীবন তঞ্চঙ্গ্যার



সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুনীতি বিকাশ চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন কর্ণফুলী সরকারি কলেজ শাখার সদস্য প্রশান্ত তালুকদার। এছাড়াও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কাপ্তাই থানা ও কর্ণফুলী সরকারি কলেজ শাখার নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সদস্য সুনীতি বিকাশ চাকমা বলেন, এম এন লারমা ছাত্রজীবন থেকেই দূরদর্শী ও সংগ্রামী ছিলেন। যতদিন মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ ধারণ করতে পারবোনা ততক্ষণ আমরা আমাদের মুক্তি আমাদের অধিকারের প্রয়োজনীয়তার তারনা বুঝতে পারবোনা। তিনি একাধারে শিক্ষক, আইনজীবী ও সংসদ সদস্য হয়েও ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে শোষিত জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। জুম্ম জনগণকে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে তিনি ঐতিহাসিক সংসদ বর্জনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাই এম এন লারমার আদর্শ তার জীবন ও দর্শন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

সজল চাকমা বলেন, জাতির সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অধিকার আদায় করতে একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এম এন লারমা জুম্ম সমাজের মাঝে জাগিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের একমাত্র কান্ডারী রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করে। যে সংগঠনের হাত ধরে দীর্ঘ দুই দশক ধরে শাসকগোষ্ঠীর জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র লড়াই হয়েছে। সে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার বাধ্য হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হতে। কিন্তু দীর্ঘ বছর পার হলেও সে চুক্তি এখনো বাস্তবায়নে কোন অগ্রগতি জুম্ম জনগণ দেখতে পায়নি। শাসকগোষ্ঠী চুক্তি বাস্তবায়ন না করে উল্টো চুক্তিকে লঙ্ঘন করে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে জিইয়ে রেখেছে।

তিনি আরও বলেন, বক্তারা এম এন লারমার বিপ্লবী চেতনা ও জীবনদর্শন শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পাহাড়ের ইতিহাস ও জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং আন্দোলনমুখী হওয়ার আহ্বান জানান।

রোয়াংছড়িতে এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকীতে পিসিপি'র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত



জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)-এর ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রোয়াংছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের রোয়াংছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি অংশৈসাই মারমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অংসাপ্রু মারমার সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক চসিংথোয়াই মারমা।

স্বাগত বক্তব্যে চসিংথোয়াই মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের আত্মপরিচয়, ভূমি অধিকার, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের প্রশ্নে এম এন লারমার রাজনৈতিক ভূমিকা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে বিপুলসংখ্যক পাহাড়ি মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও ভূমি হারানোর ঘটনা এম এন লারমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও পরিচয়ের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায় তিনি গণপরিষদ থেকে ওয়াকআউট করেন এবং সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি, যা পাহাড়িদের আত্মপরিচয়ের লড়াইয়ে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।



স্মরণসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস), রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাবেক সভাপতি মঙ্গলসেন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, এম এন লারমার জীবন, রাজনৈতিক দর্শন ও সংগ্রামের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চিন্তা ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে পাহাড়ের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষায় তরুণ সমাজকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্মরণসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক তিতু তঞ্চঙ্গ্যাসহ স্থানীয় নেতাকর্মী ও ছাত্র-যুব প্রতিনিধিরা। পরিশেষে সভাপতি অংশৈসাই মার্মার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে স্মরণসভার সমাপ্তি ঘটে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নাই, সংবিধান মেনেই আমরা পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছি: রাঙ্গামাটিতে আলোচনা সভায় ঊষাতন তালুকদার

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটির শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি-২০২৬'র আহ্বায়ক ঊষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজয় কেতন চাকমা, সভাপতি, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, সুস্মিতা চাকমা, বিশিষ্ট আইনজীবী ও অন্তর চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।

আলোচনা সভার শুরুর পূর্বে উদীয়মান কবিদের অংশগ্রহণে এক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদযাপন কমিটির সদস্য রীনা চাকমা। উদযাপন কমিটির সদস্য নান্টু ত্রিপুরা ও আশিকা চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব জুয়েল চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিশির চাকমা বলেন, 'এম এন লারমা মাত্র ৪৪ বছর বেঁচেছিলেন। ক্ষণজন্মা এই মানুষটির বর্ণাঢ্য জীবনের দিকে তাকালে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তার সংসদীয় বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা বারেবার তুলে ধরেছেন। স্বল্প সময়ের জীবনে তিনি নিজেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের একজন পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও জুম্ম জনগণ যে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার অধিকারী, আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন, আত্ম-মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি সেটি বহির্বিশ্বে তুলে ধরার প্রয়াস প্রথম করেছেন এই অবিসংবাদিত নেতা। প্রবল আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন এম এন লারমা ৩২ বছরেই সংসদে বাঙালিকরণের প্রতিবাদ করেছেন এবং স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জোর দাবি করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে পার্বত্যবাসীর কোনরূপ সম্মতি ও সমঝোতা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা খুবই





উদ্বেগজনক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি এখানকার জনমানুষের আবেগ, গণমানুষের প্রাণের দাবি। সুতরাং এই দাবি উপেক্ষা করা সরকারের জন্য মারাত্মক ভুল হবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি শুধুমাত্র জেএসএসের–এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সবাইকে একই কাতারে দাঁড়িয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি তুলতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ কী বলতে চায়, তারা কী ভাবছে- সেটি সরকারকে অবশ্যই শুনতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'বর্তমান সময়ে এম এন লারমার অবদান, আদর্শ নতুনভাবে জানার অবকাশ তৈরি হয়েছে। অবলুপ্তির পথে ধাবমান জুম্ম জনগোষ্ঠী প্রগতিশীল, মুক্তিকামী ও সংগ্রামের দিকে ধাবিত করেছেন সেটি অবশ্যই আমাদের চর্চার বিষয়। বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জাতির মুক্তির জন্য তিনি রূপরেখা প্রদান করেছেন। এম এন লারমা শুধুমাত্র পাহাড়িদের নেতা নয়, তিনি সমগ্র পৃথিবীর নিপীড়িত, শোষিত মানুষের নেতা। তাই উনার প্রদর্শিত মানবতাবাদী আদর্শ চর্চা করতে হবে, ধারণ করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নাই। সংবিধান ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারকে আবেগ দিয়ে পরিচালিত করলে হবে না, এটি বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত করতে হবে। সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে সৎ মায়ের সন্তান মনে করলে চলবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার কোনো কিছু করতে হলে অবশ্যই জনসংহতি সমিতিকে হিসেব করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে দুরে ঠেলে দেবেন না। সবকিছু হিসেব-নিকেশ করে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ঊষাতন তালুকদার আরো বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করেন জুম্মরা জুম্মরা কেন হানাহানি করে? আমাদের আন্দোলনে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেছে, দালালি করতেছে, তাদেরকে যদি বুঝিয়ে কাজ না হয়, আলোচনার মাধ্যমে যদি সমাধান করা না যায়– তাহলে কী করা? ইউপিডিএফ ভাওতাবাজির মাধ্যমে পূর্ণস্বায়ত্বশাসনের দাবি করে প্রত্যাগত শান্তিবাহিনীর ৮৭জন সদস্যকে হত্যা করেছে। ইউপিডিএফ ও কেএনএফ বিশেষ বাহিনী সৃষ্টি করেছে ও পরিচালনা করে। তারা জঙ্গিদের সাথে মিলেমিশে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পায়তারা চালাচ্ছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিজয় কেতন চাকমা বলেন, 'এম এন লারমা গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর পরিবারের অবদান অপরিসীম। যে ব্যক্তি নিজের জাতি, সমাজকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তার আদর্শ ও শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই ধারণ করতে হবে। আমাদের মা-বাবারা যদি সংগ্রামী, সাহসী ও আদর্শিক হয়, সে পরিবারের সন্তানেরা অবশ্যই প্রতিবাদী, আদর্শিক ও সংগ্রামী হয়ে উঠবে। ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সংগ্রামী, সাহসী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে।

বর্তমান নেতা সন্তু লারমা স্যার প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের তিনজন রাজা, তিন জন এমপি ও তিনজন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেও তাদেরকে আমাদের সাথে একসাথে আন্দোলন করার জন্য পাওয়া যায় না। তারা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হন। অধিকার তো কেউ কাউকে দেয় না; নিজেদের অধিকার নিজেদেরকে ছিনিয়ে আনতে হবে। ইউপিডিএফের পূর্ণস্বায়ত্বশাসনের দাবি আমার হাসি পাই। এই পূর্ণস্বায়ত্বশাসন কি ভাইকে মারলে পাওয়া যাবে? পূর্ণস্বায়ত্বশাসন হলো এম এন লারমার গড়ে তোলা লড়াই সংগ্রামের আকাশে কালো মেঘের মতো। ২৮ বছর আগে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সেখানে পূর্ণস্বায়ত্বশাসনের দাবি তো অবশ্যই হাস্যকর। ইউপিডিএফকে এই অবাস্তব দাবি থেকে সরে এসে প্রকৃতভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সুস্মিতা চাকমা বলেন, 'সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এম এন লারমা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যে আদর্শের জন্য রাজনীতি করেছেন সেই আদর্শকে আমরা বর্তমানে ঠিকমতো ধারণ করতে পারছি না। এম এন লারমার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই চুক্তির ফলে যে কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, সেগুলো এখন ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাকাঠামোর অংশ হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবার।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে একই স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা শেষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (ক) বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৌষ্ঠব চাকমা, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন ভুবনজয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী কবিতা চাকমা ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বরকল সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধনাঢ্য চাকমা। (খ) বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন ঢাকা কমার্স কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মেরিন তৈনা, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন রাঙ্গামাটি সরকারি



কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তিশা মুনি চাকমা ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির কাজলা চাকমা। (গ) বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী কাঞ্চনা চাকমা, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সেবিকা চাকমা ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শতাব্দী চাকমা।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় (ক) বিভাগে প্রথম হয়েছেন হিল পয়েন্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির আয়ুস্মিতা চাকমা, দ্বিতীয় হয়েছেন রাজদ্বীপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী স্মৃতিমান চাকমা ও তৃতীয় হয়েছেন রাণী দয়াময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মনদ্বীপ চাকমা; (খ) বিভাগে প্রথম হয়েছেন রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির সামান্ত শ্রেষ্ঠী চাকমা, দ্বিতীয় হয়েছেন রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিলয় বড়ুয়া ও তৃতীয় হয়েছেন রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রত্যয়া

চাকমা; (গ) বিভাগে প্রথম হয়েছেন লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আল নিসা, দ্বিতীয় হয়েছেন সেন্ট ট্রিজার স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সপ্তার্ষ চাকমা ও তৃতীয় হয়েছে বন্দুকভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নীতিশ চাকমা।

চট্টগ্রামে এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গান, ছড়া, কবিতা, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা



গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার সুলতান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গান পরিবেশনা, কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য শরৎ জ্যোতি চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনাবি চাকমা, আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম উত্তর জেলার প্রতিনিধি জুনিয়া ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি আদর্শ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন কর্মী মোহাম্মদ আমান মাসুদ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, অবিভাবক ও ২০২৬ এর এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান নেতা এম এন লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার হিল একাডেমির শিক্ষিকা নিরতা চাকমা। এরপর গান পরিবেশন করেন মডেলটি চাকমা, বৃষ্টি চাকমা ও নবয় তঞ্চঙ্গ্যা, কবিতা পাঠ করেন শ্রেয়সি চাকমা, মডেলটি চাকমা এবং ছড়া পাঠ করেন পূর্ণতা তালুকদার। এর পরপরই ২০২৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং আয়োজনকে পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বইপত্র উপহার দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, আজ মহান নেতা এম এন লারমা জন্মদিন। আজকের এই দিনটি যথাযথ মর্যাদার সহিত গ্রামগঞ্জ থেকে শহর বন্দরে পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এম এন লারমার নীতি আদর্শকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

অনিল বিকাশ চাকমা বলেন, আমরা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ, চিন্তা-চেতনা ধারণ করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি কৃতি শিক্ষার্থীদের শুভকামনা জানান এবং মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ, চিন্তা-চেতনা লালন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ আমান মাসুদ তার বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শকে ধারণ করে এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।



আদর্শ চাকমা বলেন, এম এন লারমা একজন আদর্শিক, ত্যাগী ও নির্যাতিত, নিপীড়িত অধিকারহারা গণমানুষের নেতা।

অন্বেষ চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা এমন একজন মানুষ যে মানুষের জন্ম না হলে আমরা অধিকার-স্বাধিকার কী জিনিস তা জানতে পারতাম না।

রাঙ্গামাটির আসামবস্তিতে এম এন লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী



জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় আসামবস্তি এলাকাবাসীর উদ্যোগে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জগদীশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, ১০৪নং ঝগড়াবিল মৌজার কার্বারী বুলিচাই মারমা প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সভাপতি দেব মোহন চাকমা, শহর কমিটির সদস্য জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা।

শহর কমিটির সদস্য রিটেশ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শান্ত আসাম এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আসামবস্তির বাসিন্দা লোমা লুসাই।

প্রধান অতিথি জগদীশ চাকমা বলেন, এম এন লারমা শোষিত নিপীড়িত মেহনতি মানুষের নেতা ছিলেন। বর্তমান সময়েও এম এন লারমা খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে এম এন লারমার প্রস্তাবনাগুলো এখন বাংলাদেশের জনগণ উপলব্ধি করছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণে সরকার তার সংসদীয় প্রস্তাবনাগুলো এখনও গ্রহণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে বহু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। বর্তমান সরকার যদি অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ গঠন করতে চায় তাহলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অবশ্যই আদিবাসীদেরকে যুক্ত করতে হবে।

সুমিত্র চাকমা বলেন, এম এন লারমার আদর্শকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, শিশুদেরকে আদর্শিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবার ও সমাজ থেকে যাতে এম এন লারমার মতো দেশ ও জাতপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সেজন্য অবশ্যই শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

কাপ্তাইয়ে এম এন লারমা'র ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা



গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কাপ্তাই উপজেলা কমিটির উদ্যোগে ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যালয়ের মিলনায়তনে এম এন লারমা'র ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কাপ্তাই উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কাপ্তাই উপজেলা কমিটি ও রাইখালী মৌজার হেডম্যান উসুয়ে সুয়ে চৌধুরী মিশুক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মনুচিং মারমা এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদক ইন্টু মনি তালুকদার।



এছাড়াও এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের রাঙ্গামাটি জেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সাবেক ছাত্র নেতা অনিল মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সদস্য অনুপম খিয়াং, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই উপজেলা শাখার সভাপতি কেতন তঞ্চঙ্গ্যা।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কাপ্তাই উপজেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক মেম্বার অংসাচিং মারমা এবং এম এন লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন প্রিয়াঙ্কা তঞ্চঙ্গ্যা।

আলোচনা সভায় আলোচকবৃন্দ বলেন, এম এন লারমার দেখানো চিন্তা-চেতনা, দর্শন, নীতি-আদর্শকে লালন করে সকল জাতিসত্তাকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজকে আরো অধিকতর সংগ্রামী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনকে তথা অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে।

আলোচকবৃন্দ আরো বলেন, এম এন লারমার জীবন দর্শন বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়। আগামী দিনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলেও জুম্ম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সকলকে এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। কাপ্তাই উপজেলায় প্রায় ছয়/সাতটি আদিবাসী জাতির বসবাস। তাই এই ভিন্ন ভাষার, সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষায় একতাবদ্ধ হয়ে জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা বলেন, আজকে এম এন লারমা ৮৭তম জন্মবার্ষিকী। তিনি মাত্র মাত্র ৪৪ বছর বেঁচেছিলেন। এই ক্ষণজন্মের মধ্যেও তিনি অধিকারহারা ও নিপীড়িত মানুষের জন্য যে কাজ করে গেছেন তা ইতিহাসে অনন্য। আমাদেরকে তারই নীতি আদর্শকে লালন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিয়ে চুক্তির বাস্তবায়ন ও আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমাদেরকে এম এন লারমার দেখানো জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

বহুত্ববাদী ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আজও প্রাসঙ্গিক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

বহুত্ববাদী ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী, লেখক, শিক্ষক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

গত ৩ অক্টোবর ২০২৬, ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষা ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাংবিধানিক বহুত্ববাদ' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ আহ্বান জানান। আইপিনিউজ বিডি ও সরং রিসার্চ এন্ড রিসোর্স সেন্টার যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে।

আইপিনিউজ বিডির উপদেষ্টা সম্পাদক সতেজ চাকমার সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ। সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, কবি ও সম্পাদক সাখাওয়াত টিপু এবং বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা।

মূল প্রবন্ধে পাভেল পার্থ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের পাশাপাশি গ্রাফিতিগুলো জনআকাঙ্ক্ষার দৃশ্যমান প্রকাশ হয়ে উঠেছিল। তবে সময়ের সঙ্গে শ্রমজীবী, আদিবাসী, শিশু ও নিম্নবর্গের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা মূলধারার বয়ানে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। গ্রাফিতি মুছে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের বহুমাত্রিক জনআকাঙ্ক্ষাকেও আড়াল করা হয়েছে। তিনি জুলাইকে শুধু শাসন পরিবর্তনের ঘটনা হিসেবে না দেখে দীর্ঘদিনের বৈষম্য ও ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধে চলমান প্রতিরোধের অংশ হিসেবে দেখার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, গ্রাফিতিতে কল্পনা চাকমার নিখোঁজের বিচার ও 'ইনডিজেনাস লাইভস ম্যাটার'-এর মতো বার্তার অধিকার ও স্বীকৃতির দাবি সামনে এসেছে।একই সঙ্গে 'পাহাড়ে কবে মুক্তি মিলবে' বা 'পরাধীন পাহাড়'-এর মতো গ্রাফিতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর দীর্ঘদিনের বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রশ্নকে সামনে এনেছে বলে উল্লেখ করেন।

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি কেবল নারীর অধিকার নয়, সকল মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জুলাই সনদে বহুত্ববাদের কথা বলা হলেও বৈষম্য নিরসনে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা পরিষ্কার নয়। এমনকি ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রমেও আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। তাই সত্যিকার অর্থে বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শনকে নতুন করে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সোচ্চার হতে হবে, কথা



বলতে হবে এবং দাবি তুলতে হবে। কোনোভাবেই হতাশ হওয়া যাবে না।

অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালেই সাংবিধানিক বহুত্ববাদের কথা বলেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনেনি। তিনি কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা বলেননি, তিনি দেশের অধিকারহীন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন জাতিসত্তা এবং মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, আজকের বাংলাদেশে যে বহুত্ববাদের কথা বলা হচ্ছে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই কথাই ১৯৭২ সালেই বলেছিলেন। তাই তাঁর চিন্তা ও দর্শনকে আজকের বাস্তবতায় নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান বলেন, সংবিধানে একাধারে সাম্যের কথা বলা হলেও বৈষম্যের সুযোগ রয়ে গেছে। যার একটি উদাহরণ হলো আদিবাসীদের 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। অথচ একটি জাতির পরিচয় নির্ধারণ করে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা নিজেদের এলাকায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। অথচ পার্বত্য চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণ করা। কিন্তু বাস্তবে সেই লক্ষ্য এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একজন মানবতাবাদী চিন্তক। তিনি সাম্য, সমতা ও মানুষের অধিকারের দর্শনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শন আজও বহুত্ববাদী ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

সাখাওয়াত টিপু বলেন, একটি রাষ্ট্রের সব জনগোষ্ঠী ভালো না থাকলে সেই রাষ্ট্রও প্রকৃত অর্থে ভালো থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র তখনই বোঝা যায়, যখন সেই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষও নিরাপদে, শান্তিতে ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারে।

ফাল্গুনী ত্রিপুরা বলেন, সরকার একদিকে 'রেইনবো নেশন'-এর কথা বলছে, অন্যদিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। একটি সত্যিকারের বহুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে কথার পাশাপাশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, মর্যাদা ও পরিচয়ের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের কর্মসূচি

শিক্ষা দিবসে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ

দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহালসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্গা শিক্ষক প্রথা বন্ধ, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম





পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের (এইচডাব্লিউএফ) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এই মিছিল ও তার পরবর্তী ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সকাল ১০টায় কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে ডিসি অফিস প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়ে সেখানেই সমাবেশ শুরু হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইলি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা।

সমাবেশে উপস্থিত থেকে সংহতি বক্তব্য রাখেন এড. দীপন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য কবিতা চাকমা। এছাড়াও সংহতি বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থী মেরিন ত্রিপুরা।

অ্যাডভোকেট দীপন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম দুর্গম ও ভৌগোলিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি অঞ্চল। এ কারণে সরকারের কার্যকর সদিচ্ছা ও বিশেষ উদ্যোগ ছাড়া এ অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এত দুর্নীতি, অনিয়ম এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ কেন? তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও কার্যক্রমে বৈষম্যের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এ অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

অন্তর চাকমা বলেন, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানসম্মত ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। এর ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যেতে পারছে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তুলনামূলকভাবে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকাগুলোতে সেই সুযোগ এখনো অপ্রতুল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অসংখ্য শিশু যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কবিতা চাকমা বলেন, ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আইয়ুব খান সরকারের সময় শরীফ কমিশনের বৈষম্যমূলক ও গণবিরোধী শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ যে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, মহান শিক্ষা দিবস তারই স্মারক। সেই আন্দোলনের চেতনা থেকেই আজও শিক্ষার অধিকার ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মেরিন ত্রিপুরা বলেন, আমরা ছাত্র সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই, গণমুখী ও গরীব মানুষদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দেখতে চাই। অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক, দন্ডপ্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলির মাধ্যমে পানিশমেন্ট জোন হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্যবহার করা হয়। সরকারের এসব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়—

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে: ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট নিরসন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করাসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা; ২. দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য ভর্তি কোটা ৫% নিশ্চিত এবং প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বৃত্তি ব্যবস্থা করা; ৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে আবাসন সংকট দূরীকরণে ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস স্থাপন করা; ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতিসমূহের প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু, বিষু, বৈসু, সাংগ্রাই, চাংক্রান, সাংলান, পাতা, বিহু উৎসবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫(পাঁচ) দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা; এবং ৬. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে: ১. জেলা পরিষদের আওতাধীন সকল বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা; ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ জেলা পরিষদের সকল নিয়োগে জুম্মদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা; ৩. জেলা পরিষদের আওতাধীন সকল নিয়োগ পরীক্ষায় যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিতকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং ৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত বর্গা শিক্ষক প্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ এবং এসব অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।



মিছিল পরবর্তী ছাত্র সমাবেশের শেষে পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে জেলা প্রশাসকের নিকট এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকায় তার পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন পরিষদের সদস্য প্রেমা তালুকদার।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে চবির বুদ্ধিজীবী চত্বরে পিসিপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত



গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি এনতেস চাকমার সভাপতিত্বে এবং তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক রিশন চাকমার সঞ্চলনায় উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের দপ্তর সম্পাদক অনুত্তর চাকমা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য বিপুল তঞ্চঙ্গ্যা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। গবেষণা ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে লেজুড়বৃত্তিমূলক, সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। যা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে বলেন, পাহাড়ে এখনো বর্গা প্রথার মতো শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দূর্গম অঞ্চলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক না থাকার কারণে সেখানকার মানুষ এখনো শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দূর্নীতি ও অনিয়ম তিন জেলার শিক্ষার ভিত্তিকে ভঙ্গুর ও মেরুদণ্ডহীন করে দিয়েছে।

এছাড়া বক্তারা পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর করার দাবি জানান এবং সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

শেষে উক্ত সমাবেশ থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়–

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে: ১. শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি কর; ২. শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসন কর; ৩. অবিলম্বে শাটল ট্রেনে বগি ও শিডিউল বৃদ্ধি কর; ৪. চবি মেডিকেলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসক ও চিকিৎসা সরঞ্জামসহ পর্যাপ্ত মেডিসিন নিশ্চিত কর; এবং ৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ভাষা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কর।

সরকারের কাছে: ১. উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা নিশ্চিত কর; ২. সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কর; ৩. আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত কর; ৪. পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ কর; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট নিরসন কর।

আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহালসহ ৫ দফা দাবিতে বান্দরবানে পিসিপি'র মিছিল



দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহাল, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্গা শিক্ষক প্রথা বন্ধ, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ, পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখা।



গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০ ঘটিকায় বান্দরবান প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি রণি ত্রিপুরা এবং সঞ্চালনা করেন একই শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ডমং মারমা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিটন তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ম্রো স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রিংয়ং ম্রো, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী মাহিনু আক্তার, পিসিপির বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জেকিপ্রু মারমা, পিসিপির সদর থানা শাখার সভাপতি উবাথোয়াই মারমা, পিসিপির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডিসন চাকমা, পিসিপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক উশৈহ্লা মারমাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সংকট, পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামোর অভাব এবং শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের কারণে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারকে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহাল, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্গা শিক্ষক প্রথা বন্ধ, স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক সংকট নিরসন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকারকে এসব দাবি বাস্তবায়নে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ৫% কোটা পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকায় পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র মিছিল

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকাল ৩ ঘটিকার সময়ে অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহাল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্গা শিক্ষক প্রথা বন্ধ, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা



মহানগর শাখা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) ঢাকা মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় এক মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি অনিক কুমার দাশ, পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি কনেজ চাকমা, পিসিপির ঢাকা পলিটেকনিক শাখার সহ-সভাপতি ক্যারি চাকমা, গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (গাসু) ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বগত ম্রং এবং আদিবাসী যুব ফোরামের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তুম্পা হাজং প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামংচিং মারমার সঞ্চালনায় এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত মিছিল ও ছাত্র সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নেবাই অং খুমী।

এই সময় অনিক কুমার দাশ বলেন, মহান শিক্ষা আন্দোলনের ৬৪ বছর পেরোলেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আশানুরূপ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ফলে শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্যতে পরিণত হয়েছে এবং বাংলাদেশের গরীব এবং নিম্ন শ্রেণির মানুষদের সন্তানরা শিক্ষা লাভের থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও নাজুক। শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে পাহাড়ের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিন দিন ধ্বংস করা হচ্ছে।

কনেজ চাকমা বলেন, বৈষম্যহীন ও গণমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্রত নিয়ে তৎকালীন সময়ে শিক্ষা আন্দোলন সংঘটিত হলেও তা এখনো অবাস্তবায়িত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নাগরিকের মৌলিক অধিকার এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আরো বলেন, পূর্বে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা খাতে ৫% কোটা ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে তা কমিয়ে আনায় আদিবাসীরা আরও



পিছিয়ে পড়ছে এবং প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ক্যারি চাকমা বলেন, বিভিন্ন সরকার তাদের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে পুতুল শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করা ও সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ৫% কোটার বিধান থাকলেও তা কার্যকর অর্থে বাস্তবায়ন না হওয়ায় আদিবাসী শিক্ষার্থীরা আরও পিছিয়ে পড়ছে।

স্বগত ম্রং বলেন, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের আদিবাসীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং চাকরি ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতলে আদিবাসীদের ওপর বৈষম্যের মাত্রা আরও তীব্র।

সৃজন মৃ বলেন, রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা প্রতিষ্ঠায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। যা চরম ন্যাক্কারজনক এবং হতাশাজনক। অতি শীঘ্রই সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা আরও যুগ যুগান্তর পিছিয়ে যাবে। যা আদতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথেই বড় অন্তরায়।

তুম্পা হাজং বলেন, রাষ্ট্রের উচিত কাগুজে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা না বলে তা বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। যা বাংলাদেশের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সামগ্রিক সমৃদ্ধি বয়ে আনার পথকে সুগম করবে।

ছাত্র সমাবেশ পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে মিছিল আরম্ভ করে কলাভবন প্রদক্ষিণ করে আবারও অপরাজেয় বাংলা পাদদেশে গিয়ে সভাপতির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আয়োজিত মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ থেকে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত চার দফা দাবি উত্থাপন করা হয়: ১. দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহাল কর; ২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্গা শিক্ষক প্রথা বন্ধ কর; ৩. শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ কর; এবং ৪. পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ কর।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন

আদিবাসীদের সাংবিধানিক ও আইনগত স্বীকৃতি দিতে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান





বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখের বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার, ভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষায় সাংবিধানিক ও আইনগত স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত গণসমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা।

গত ৯ আগস্ট ২০২৬, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাবেশে দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সংহতি জানিয়ে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সমাবেশে স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, "বিগত তিন দশক ধরে আমরা আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখের বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র আদিবাসীদের ভাষা, পরিচয়, ভূমি, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের অধিকার রক্ষায় তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবে।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার বলেন, "স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও আদিবাসী জনগণ সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমির অধিকারের সংকটে ভুগছে। আদিবাসীদের ভূমির উপর চিরায়ত প্রথা 'সমষ্টিগত মালিকানা' আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯-এ স্বীকৃতি পেয়েছে। আইএলও কভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ আদিবাসীদের জন্য আইনি দলিল। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুস্বাক্ষর করেছে। অন্যদিকে আইএলও কনভেনশনের ১৬৯ অনুস্বাক্ষর বা সমর্থন করা থেকে বিরত ছিল। আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, আইএলও কনভেনশন ১০৭-এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুসমর্থনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে।"

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "আদিবাসী দিবস শুধু আদিবাসীদের জন্য নয়; এই দিবস ভূমিহীন, অধিকারবঞ্চিত এবং নিপীড়িত সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রতীক।" তিনি বলেন, "১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২৯ বছর পেরিয়ে গেলেও চুক্তিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি।"

তিনি আরও বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে, একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরেও শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন বলেন, "স্বাধীনতার এত বছর পরও দেশের আদিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ও অধিকারহীন অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বৈষম্যহীন ও সাম্যভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও আজও দেশের সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।"

নিজেরা করি'র নির্বাহী পরিচালক খুশি কবির বলেন, "প্রতিবছর আমরা এ দিবসটি পালন করে থাকি। দিবসটি পালনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদেরও নিজস্ব অধিকার, পরিচয় ও মর্যাদা রয়েছে।"

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য ত্রিজিনাদ চাকমা। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, "আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে আমি আদিবাসী জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- বর্তমানে বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের অধিকাংশ আদিবাসী জনগণ এখনও অস্তিত্ব হুমকীর মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ক্রমশ ভূমি হারাচ্ছে, সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে তাঁদের মানবাধিকার। পার্বত্য আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ২৯টি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, কিন্তু চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোনরূপ সদিচ্ছা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছেনা। অন্যদিকে সমতল আদিবাসীদের বাস্তবতা আরো নাজুক। ভূমি থেকে উচ্ছেদ, নারী নিপীড়ন, বৈষম্য, বিচারহীনতায় আজ তারা প্রান্তিক থেকে আরো প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এই বাস্তবতা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে আদিবাসীদের লড়াইকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদিবাসী ছাত্র ও যুব সমাজকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ও দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"



আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে নিম্নোক্ত দাবিসমুহ উত্থাপিত হয়: ১. আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে; ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে; ৩. সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে; ৪. আদিবাসীদের সম্পর্কে বিকৃত , খণ্ডিত বা মিথ্যা তথ্য প্রচারকৃত সকল গণমাধ্যম, মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে; ৫. আদিবাসীদের উপর সকল নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করাসহ সকল প্রকার মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে; ৬. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০০৭ সালে গৃহীত আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র ও আইএলও ১৬৯ নং কনভেনশন অনুসমর্থন ও আইএলও কনভেনশন ১০৭ বাস্তবায়ন করতে হবে; ৭. রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উৎযাপন করতে হবে; এবং ৮. সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য ৫% সংরক্ষিত কোটা যথাযথভাবে চালু ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

আদিবাসীদের পরিচয়ের স্বীকৃতি একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হবে: আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে– ড. রাহমান নাসির উদ্দিন

আদিবাসীদের পরিচয়ের স্বীকৃতি একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ৯ আগস্ট, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের জুলাই স্মৃতি হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে "আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: জীবন সুরক্ষা ও কল্যাণময় জীবন গঠন" শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন বলেন, "বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই জ্ঞানকে টিকিয়ে রেখেছে, যা দেশের অমূল্য সম্পদ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই জ্ঞানকে সম্মান জানানো এবং আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।"

সংবিধানের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বিগত ৫০ বছরেও বদলায়নি। অথচ প্রতিটি জাতির নিজস্ব আত্মপরিচয় নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। আত্মপরিচয় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই ন্যায়সংগত লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।"

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, "আদিবাসীদের জীবন ভূমি ও প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে





জড়িত। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সরকারি নীতিমালার কারণে তারা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। সমস্যার সমাধানে আমাদের উদার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার এবং আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ দাবি করেন তিনি।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের শরৎ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি আদর্শ চাকমার সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনঙি ম্রো।

সভাপতির বক্তব্যে শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, "আদিবাসীদের বৈষম্য ও অস্তিত্ব সংকটে রেখে বাংলাদেশ কখনো সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারবে না। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের বিকাশে সাংবিধানিক স্বীকৃতি জরুরি।"

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ দক্ষিণ জেলার সভাপতি তাপস হোড় এবং ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি পাহাড়ী ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং আলোচনা পর্ব শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রঁদেভু শিল্পীগোষ্ঠী'র আয়োজনে জাতীয় সংগীত, গণসংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চুক্তি বাতিল করলে সরকারকে এর চেয়েও শক্তিশালী চুক্তি করতে হবে: রাঙ্গামাটিতে শিশির চাকমা

"জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব সংরক্ষণে আদিবাসী সমাজের সৃজনশীল শক্তি প্রয়োগ কর"—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে রাঙামাটিতে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ আগস্ট ২০২৬ সকালে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম রাঙামাটি অঞ্চলের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল-এর সভাপতি ও সাবেক উপসচিব প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট চঞ্চু চাকমা। এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের সভাপতি ও শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা। এসময় মঞ্চের সামনে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ফদাং তাং রান্দাল, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ সভাপতি থোয়াই অং মারমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য দেব প্রসাদ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি জর্জ কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, সদস্য সচিব ইন্টু মনি তালুকদার প্রমুখ।

প্রধান অতিথি শিশির চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রত্যাশার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই কার্যকর ফল পাওয়া সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাতিল করা হলে সরকারকে 'নাকে খত দিয়ে' এর চেয়েও শক্তিশালী চুক্তি করতে হবে। পার্বত্য চুক্তি বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে





করা হয়েছে। এই চুক্তিতে কোনো অসাংবিধানিক বিষয় রাখা হয়নি। তাই চুক্তি বাতিল নয়, বরং এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারকে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানান নিপীড়নের শিকার। অধিকার বঞ্চিত হওয়ায় আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ দ্রুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করার জোর দাবি জানান।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, আমাদের পরিচয় রাষ্ট্র চাপিয়ে দিতে পারে না। যা মানবাধিকার লঙ্ঘন। আমরা বাঙালি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি নয়, আদিবাসী হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই। জাতিসংঘ ঘোষিত অধিকার বাংলাদেশ সরকার বাস্তবায়ন করে সেই দাবি করছি আমরা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি চাইলেও সরকার সেই দাবিগুলো বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করছেন। আমরা 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি চাই।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পাহাড়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে পরিবর্তন ও আধুনিকতার প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পার্বত্য চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নসহ ভূমি সমস্যা সমাধান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।

আলোচনা সভা শেষে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে গিয়ে শেষ হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত

'Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-Being'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৬' পালিত হয়েছে।

গত ৯ আগস্ট ২০২৬, রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনস্ কমপ্লেক্স ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাজশাহী মহানগর শাখা, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ রাবি, গারো শিক্ষার্থী পরিবার রাবি এবং আদিবাসী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–এই চার সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উত্তরীয় পরিধানের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাবির প্রাক্তন ছাত্র উপদেষ্টা ও ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আমীরুল ইসলাম কনক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: গোলাম সারওয়ার এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অভিজিৎ রায়। এতে আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কালচারাল একাডেমির পরিচালক হরেন্দ্র নাথ সিং। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী উবাথোয়াই মারমা এবং স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী ইন্দ্রজিৎ বেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আমীরুল ইসলাম কনক বলেন, "সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে এবং তাদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: গোলাম সারওয়ার বলেন, "আদিবাসীরা কখনো ঔপনিবেশিক শাসন মেনে নেয়নি, বরং ইতিহাসের বিখ্যাত আন্দোলনগুলোতে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে তাদের বাঙালি পরিচয় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তৎকালীন সাংসদ এম এন লারমা তা





প্রত্যাখ্যান করে ওয়াক-আউট করেছিলেন।" তিনি পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসীদের নিজস্ব বৈষম্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর জোর দেন।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অভিজিৎ রায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রসার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরামর্শ দেন।

অপরদিকে, বিভাগীয় কালচারাল একাডেমির পরিচালক হরেন্দ্র নাথ সিং বলেন, "অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। তাই আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন।"

আলোচনা সভায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহীর সুভাষচন্দ্র হেমব্রম সমতলের আদিবাসীদের উচ্ছেদ, ইপিজেডের নামে ভূমি দখল ও হত্যার বিচার দাবি করেন।

এছাড়াও অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিথী আক্কা, আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রিন্স হেমন্ত টুডু, গারো শিক্ষার্থী পরিবারের সভাপতি জেমস অর্ণব এবং পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শীত কুমার উঁরাং সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশের দাবি তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে সুমন চাকমা পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সভা থেকে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

উত্থাপিত উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হলো: ১. আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং পাঠ্যপুস্তকে তাদের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্তকরণ; ২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন; ৩. জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র অনুস্বাক্ষর; ৪. পাহাড় ও সমতল আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং ধর্ষণের বিচার নিশ্চিতকরণ; ৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য কোটার আসন বৃদ্ধি, প্রতি হলে ৩-৪টি কক্ষ বরাদ্দ এবং টিএসসিসিতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য রুম বরাদ্দ।

চার আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভাটি শেষ হয়।

আদিবাসী পরিচয় নিয়ে দুই মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ২৫ ছাত্র ও যুব সংগঠনের যৌথ বিবৃতি

আদিবাসী পরিচয়কে অপ্রাসঙ্গিক ও বাংলাদেশে কোনো 'আদিবাসী' গোষ্ঠী নেই মর্মে সরকারের দুই মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যকে 'ইতিহাস ও বাস্তবতা বিবর্জিত' আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জানিয়েছে ২৫টি আদিবাসী ছাত্র, যুব, নারী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। একই সঙ্গে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ ৪ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলো। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬, প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো এ প্রতিবাদ জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১১ আগস্ট ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন আদিবাসী পরিচয় নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন, তা দেশের প্রায় ৫০টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠীকে ক্রমাগত প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সরকারই তাদের ন্যায্য অধিকার দেয়নি। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এমন একরৈখিক বক্তব্য আদিবাসীদের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলছে।"

২০০৭ সালের জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রের কথা উল্লেখ করে এতে বলা হয়, তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ এতে অনুস্বাক্ষর না করলেও একটি দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এই ঘোষণা মানা নৈতিক দায়িত্ব। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ব দরবারে নিজেদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রমাণ করতে অন্যান্য দেশগুলো যেখানে পরবর্তীতে এটি মেনে নিয়েছে, বাংলাদেশেরও সে পথেই হাঁটা উচিত ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বিকাশের সুযোগ না দিয়ে 'মূলধারার' সাথে একীভূতকরণের যে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, তা বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফার 'রেইনবো-নেশন' ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সংগঠনগুলোর চার দফা দাবি হলো: ১. বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে আদিবাসী হিসেবেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে; ২. আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ তাঁদের ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার প্রতিষ্ঠা



করতে হবে; ৩. আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জ্ঞান সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও বিকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; এবং ৪. আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র-২০০৭ বাস্তবায়ন করতে হবে।

যৌথ এই বিবৃতিতে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল; ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম, বাংলাদেশ; বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরাম; বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন; বাংলাদেশ ম্রো স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন; বাংলাদেশ খুমী স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন; বাংলাদেশ খেয়াং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন; বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন(বাগাছাস); বাংলাদেশ গারো স্টুডেন্ট ফেডারেশন (জিএসএফ; বাংলাদেশ হাজং ছাত্র সংগঠন (বাহাছাস); বাংলাদেশ মাহাতো আদিবাসী ছাত্র সংগঠন); হাজং স্টুডেন্ট কাউন্সিল (হাসুক); বাংলাদেশ গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু); খাসি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন; হিল উইমেন্স ফেডারেশন; পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ; বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ; বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম; বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ; আরফি, জাহাঙ্গীরনগর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার; ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ও এসোশিয়েশন অফ ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্টস, সাস্টসহ মোট উক্ত ২৫টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন।

আন্তর্জাতিক

এমরিপের ১৯তম অধিবেশনে ভবিষ্যত কার্যক্রম ও সুপারিশমালার অগ্রগতি বিষয়ে অগাস্টিনা চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন



গত ১৬ জুলাই ২০২৬ জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের (এমরিপ) ১৯তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা এজেন্ডা আইটেম ১১: "পূর্ববর্তী গবেষণা ও পরামর্শে প্রণীত সুপারিশমালার ধারাবাহিকতা সহ এক্সপার্ট মেকানিজমের ভবিষ্যত কার্যক্রম" বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এমরিপের ১৯তম অধিবেশনটি শুরু হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ অফিসে গত ১৩ জুলাই ২০২৬ এবং শেষ হয় ১৭ জুলাই।

তার বক্তব্যে অগাস্টিনা চাকমা বলেন, "ঊনত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে বেসামরিকীকরণ, স্বশাসন, ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে। ঊনত্রিশ বছর পর, সেগুলো এখনো বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই বছর এই অপেক্ষা আরও গুরুতর রূপ নিয়েছে। সৈন্যদের প্রত্যাহারের পরিবর্তে সরকার ৩৪টি নতুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আউটপোস্ট স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প এখনো রয়ে



গেছে। এই অঞ্চলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব পরিষদসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না, হচ্ছে বরং "অপারেশন উত্তোরণ" নামক এক সামরিক আদেশের মাধ্যমে, এমন এক পলিসির জন্য যা কেবল বেদখলের জন্ম দিয়েছে। যেখানেই চুক্তি বাস্তবায়ন হয় না, সেখানেই ভূমি বেদখল, হামলা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা সংঘটিত হয়।

প্রথমত: ২০২২ সালে এমরিপ কর্তৃক পুনর্ঘোষিত, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আদিবাসীদের সুরক্ষায় একটি নিবন্ধনস্থান সহ, চুক্তি ও সমঝোতা বিষয়ক বিরোধ সমাধানকল্পে একটি আন্তর্জাতিক মেকানিজমের আহ্বান জানাই। তার রূপ যাই হোক, জুম্মদের মত সমাজসমূহের ক্ষেত্রে তা কার্যকরভাবে উপস্থাপিত হয়নি। আমি নতুন কোনো কাঠামোর কথা বলছি না। আমি মেকানিজমকে একটি দৃশ্যমান ব্যবস্থার অনুরোধ জানাই এবং সেটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিয়ে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ এখন তার সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা (ইউপিআর) চক্রের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে এবং তার একটি মধ্য-মেয়াদী রিপোর্ট পেশ করার সুযোগ রয়েছে। আমি এটা কাজে লাগানোর জন্য এই পরিষদকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন: ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি কমিশন এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাংলাদেশকে চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

আগামী বছর পার্বত্য চুক্তির ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছর কোনো বিলম্ব নয়, এটা একটা বেছে নেওয়া বিষয়। জুম্মরা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য একটি চুক্তি করেনি। তারা মুক্ত হওয়ার জন্যই এই চুক্তি করেছে।"

সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যকার শান্তি চুক্তিগুলো প্রায়শই বাস্তবায়িত হয় না: জাতিসংঘের হাই কমিশনারের অফিসে— বিনোতাময় ধামাই

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্কের সঙ্গে জেনেভার জাতিসংঘের অফিসে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে 'এক্সপার্ট মেকানিজম অন দ্য রাইটস অব ইন্ডিজেনাস পিপলস' (এমরিপ)-এর সাবেক বিশেষজ্ঞ বিনোতা ময় ধামাই বলেছেন, "১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মতো সরকার ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার শান্তি চুক্তিগুলো প্রায়শই বাস্তবায়িত হয় না।"

গত ১৬ জুলাই ২০২৬ এশিয়া অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। ১৩ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত এমরিপের ১৯তম অধিবেশন চলাকালে 'গ্লোবাল ইন্ডিজেনাস ককাস' এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিনোতা ময় ধামাইয়ের নেতৃত্বে গ্লোবাল ইন্ডিজেনাস ককাসের একটি প্রতিনিধিদল হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তার বক্তব্যে ধামাই বলেন, এশিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্তমানে সামরিকায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ (এক্সট্রাক্টিভিজম), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ উদ্যোগ, সংকুচিত নাগরিক পরিসর এবং দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরসহ নানা সংকটের সম্মিলিত প্রভাবের মুখোমুখি। এসব চ্যালেঞ্জ আদিবাসীদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা সামরিকীকরণ, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ, কঠোর নজরদারি এবং আদিবাসী নেতা-কর্মীদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। এর ফলে তাদের ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিশেষ করে আদিবাসী নারী, কিশোরী ও মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঝুঁকি বাড়ছে।

ধামাই আরও বলেন, আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে খেয়ালখুশিমতো গ্রেপ্তার, কৌশলগত আইনি হয়রানি, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার এবং ডিজিটাল নজরদারির শিকার হচ্ছেন। ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত পরিবেশবাদী কর্মীরা বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীদের মধ্যে অন্যতম।

এশিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পক্ষ থেকে তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের প্রতি আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষায় আরও কার্যকর ও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এর মধ্যে নাগরিক পরিসর রক্ষা, প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ প্রতিরোধ এবং আদিবাসী নেতা, প্রবীণ ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এশিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঞ্চলে আরও ব্যাপক ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান, যাতে আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।





ধামাই বলেন, রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমীমাংসিত সংঘাতের কারণে এশিয়ার বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিগুলো প্রায়ই বাস্তবায়নের অভাবে কার্যকারিতা হারায়। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বাংলাদেশের ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, যা এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং অভ্যন্তরীণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অধিকারগুলো যথাযথ আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিসকে এশিয়ার দেশগুলোর সরকারকে প্রয়োজনীয় আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

পরিশেষে, বিনোতাময় ধামাই এশিয়ায় মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিসের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক কাজের জন্য নিবেদিত 'ফোকাল পয়েন্ট' বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের আহ্বান জানান। পাশাপাশি এ ধরনের পদে আদিবাসী পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন।

'বাংলাদেশে ট্রাইব্যালদের বিলুপ্তি কীভাবে মিজোরামকে প্রভাবিত করতে পারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জুলাই ২০২৬ দুপুর ১২ টায় ভারতের মিজোরাম রাজ্যের রাজধানী আইজলের ট্রেজারি স্কোয়ারে অবস্থিত আইঅ্যান্ডপিআর (I&PR) মিলনায়তনে দ্য জৌজাম টাইমসের (The Zozam Times) উদ্যোগে 'বাংলাদেশে ট্রাইব্যালদের (জুম্মদের) বিলুপ্তি কীভাবে মিজোরামকে প্রভাবিত করতে পারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিজোরাম সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সাপডাঙ্গা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর (রাজনৈতিক) উপদেষ্টা, বিধায়ক ও জেডপিএম-এর সহ-সভাপতি লালমুয়ানপুইয়া পুন্তে।





সেমিনারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সাপডাঙ্গা বলেন, "বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল থেকে মিজোরামে পালিয়ে আসা জো বংশোদ্ভূত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে বা পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, "বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জো আদিবাসীদের এলাকায় দেশের সমতল থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম প্রবেশ করছে এবং সেখানে বসবাস করতে চাইছে। এ কারণে নিরুপায় হয়ে নিরাপত্তার খোঁজে তারা পালিয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও পালিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিতাড়িতদের মধ্যে চাকমা, মারমা(মগ) এবং ব্রু সম্প্রদায়ও থাকবে। গির্জাগুলো (ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) তাদের গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদের দেখাশোনা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোও রাজ্যের নিরাপত্তা বজায় রেখেই তাদের আশ্রয় দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "এই পরিস্থিতিতে জো বংশোদ্ভূত এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কীভাবে গ্রহণ করা হবে তাও ভেবে দেখা দরকার। সরকারকেও হয়তো এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।" তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই সেমিনারটি সরকার, জাতি, গির্জা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর চোখ খুলে দিতে সাহায্য করবে।

বিশেষ অতিথি মুখ্যমন্ত্রীর (রাজনৈতিক) উপদেষ্টা লালমুয়ানপুইয়া পুন্তে বলেন, প্রতিবেশী অঞ্চলের মানুষের অবস্থা এবং তাদের মিজোরামে প্রবেশের কারণগুলো স্পষ্টভাবে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থাকে স্পষ্ট করে। এ ধরনের সময়োপযোগী সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

দ্যা জৌজাম টাইমসের সম্পাদক তুইখুয়াহথাঙ্গার সভাপতিত্বে এই আলোচনায় মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. লালরিননুঙ্গা মার সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পাছুংঙা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. লালথ্লামুয়ানা রালতের সঞ্চালনায় আলোচনা পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়।

ড. লালরিননুঙ্গা মার তার প্রবন্ধ উপস্থাপনে বলেন, "১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল পাহাড়ি ৯৮.৫ শতাংশ এবং বাঙালি মাত্র ১.৫ শতাংশ ছিল, যেখানে ২০২২ সালের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী যথাক্রমে ৪৯ এবং ৫১ শতাংশে উপনীত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন উপস্থিত থাকায় বাঙালিরা সেটাকে সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করছে।"

এই অধ্যাপক আরও বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ ঠেকানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন।" কাজেই চুক্তি বাস্তবায়নের স্বপক্ষে সবাইকে একত্র হয়ে কাজ করতে পার্বত্যবাসীকে আহ্বান জানান এবং মিজোরাম সরকারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

আমন্ত্রিত হিসেবে এই সেমিনারে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, এমজেডপি এবং এমএসইউ, বিভিন্ন জাতিভিত্তিক ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি, এই বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন।

আদিবাসী পরিচয় অস্বীকার করে দুই মন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার ও আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী দাবি সিএইচটি কমিশন ও ইবগিয়ার

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় অস্বীকার করে সরকারের দুই মন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাহার, আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী এবং স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছে দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (সিএইচটি কমিশন) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া)।

গত ১৩ আগস্ট একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে এই আহ্বান জানাই দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। উল্লেখ্য, গত ১১ আগস্ট ২০২৬, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "ইনডিজেনাস আইডেন্টিটি ইজ ইরিলিভেন্ট ফর বাংলাদেশ" শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় সরকারের দুই মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

উক্ত গোলটেবিল আলোচনা সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই, সকলের একমাত্র পরিচয় বাংলাদেশি। একইসঙ্গে জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র ও আইএলও কনভেনশন ১৬৯ বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে মন্তব্য করেন।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, 'আদিবাসী' শব্দটি কেবল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশে এটি অপ্রাসঙ্গিক।

সাবেক চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মন্তব্য করেন যে, আদিবাসী পরিচয় স্বীকার করলে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে এবং দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে।



সিএইচটি কমিশন ও ইবগিয়া এর যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আদিবাসী পরিচয় ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। বাংলাদেশের আদিবাসীরা একই সঙ্গে রাষ্ট্রের নাগরিক এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আদিবাসী পরিচয় কোনো হুমকি নয়, বরং এটি একটি স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর না করলেও আইএলও কনভেনশন ১০৭, শিশু অধিকার সনদ, সিডও (CEDAW), আইসিসিপিআর এবং আইসিইএসসিআর-এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। ফলে এই হিসেবে আদিবাসীদের পরিচয়, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ এবং অর্থ আইন (১৯৯৫), আয়কর আইন (২০২৩), জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)-সহ একাধিক রাষ্ট্রীয় নীতিতে আদিবাসী বা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি রয়েছে। তাছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একাধিকবার তাদের "আদিবাসী" হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন এবং ২০০৩ সালে আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাণীও দিয়েছেন।

যৌথ বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য অঞ্চলকে ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী পরিচয় অস্বীকার অব্যাহত থাকলে পার্বত্য চুক্তির চেতনা ও শান্তিপ্রক্রিয়ার ওপর আস্থা দুর্বল হবে।

সংগঠন দুটি দুই মন্ত্রীর বিতর্কিত বক্তব্য দ্রুত প্রত্যাহার বা স্পষ্টীকরণ করা; চাপিয়ে দেওয়া অপমানজনক শব্দের বদলে আত্মপরিচয়ের অধিকারকে সম্মান জানানো; গণমাধ্যম বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহারে বাধা না দেওয়া; শান্তিপূর্ণ আদিবাসীদের আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী, ষড়যন্ত্রমূলক বা জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি এইসব বক্তব্য বন্ধ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধি সংস্থা, সংগঠন, নারী, যুবক এবং অধিকার কর্মীদের সাথে সংলাপ শুরু করা; আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইএলও ১০৭ ও ১৬৯) এবং ইউএনডিআরআইপি-র নীতিমালা অনুসরণ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য একটি স্পষ্ট ও সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতির শেষে বলা হয়, আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশ বিভক্ত হবে না; বরং তাদের পরিচয় অস্বীকার, বৈষম্য ও দমন বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে।

হেগ শহরে ইউএনপিও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্মেলন ও ২১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত



নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ শহরে আনরেপ্রেন্টেড নেশন এন্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (UNPO)-এর ৩৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নতুন রূপায়ন বিষয়ক সম্মেলন (Re-imagining Self-determination Conference) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭-২৮ আগস্ট দুইদিন ব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউএনপিও-এর প্রেসিডেন্ট রুবিনা গ্রিনউড; 'সিটি অফ পিস অ্যান্ড জাস্টিস'-এর বিশেষ দূত ডায়ানা এগলস্টন; পৃষ্ঠপোষক



এডুয়ার্ডো ওয়েলশ এবং ইউএনপিও-র মহাসচিব মার্সে মনজে কানোর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই দুদিনব্যাপী সম্মেলনের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রীতিবিন্দু চাকমা ও ইঞ্জেবি চাকমা উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের উপর দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের পর ২৯-৩০ আগষ্ট ইউএনপিও'র ২১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সকালে, ইউএনপিও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হেগের 'পিস প্যালেস'-এ ১৫টি জাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিটি প্রতিনিধিদল পর্যায়ক্রমে সেই সনদে স্বাক্ষর করেন; প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখেন এবং সংহতি ও অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন।

পঁয়ত্রিশ বছর পর, ইউএনপিও পুনরায় হেগ শহরে ফিরে এসেছে। সেই যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন সদস্য, প্রাক্তন কর্মী এবং দীর্ঘদিনের সহযোগীরা একত্রিত হয়েছেন। স্মৃতিচারণ ও ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গীকারের আবহে এখানে নানা ভাবনা তুলে ধরা হয় এবং সংগঠনের ইতিহাস ও সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইউএনপিও-র মহাসচিব মার্সে মনজে ক্যানো এবং ইউএনপিও-র প্রেসিডেন্ট রুবিনা গ্রিনউড।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বেসামরিকীকরণের আহ্বান জানিয়ে ইউএনপিও'র রেজুলেশন গ্রহণ

আনরিপ্রেজেন্টেড নেশন এণ্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইউএনপিও) তার একবিংশ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি প্রস্তাব/রেজুলেশন গ্রহণ করেছে। এই রেজুলেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং উক্ত অঞ্চলকে বেসামরিকীকরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ২৯-৩০ আগস্ট নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ সিটিতে ইউএনপিও'র ২১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রীতিবিন্দু চাকমা ও ইঞ্জেবি চাকমা অংশগ্রহণ করেন।



গত ২৯ আগষ্ট ২০২৬ সাধারণ পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর রেজুলেশনটি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনের পর রেজুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হয়।

রেজুলেশনে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার এখনো রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জিত হয়নি। যথাযথভাবে প্রবর্তিত হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা।

রেজুলেশনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে একের পর এক সরকার ব্যাপক সামরিকায়ন করে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে আসছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে সামরিকায়িত অঞ্চল। 'অপারেশ উত্তরণ' নামক সেনাশাসন সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প কার্যকর রয়েছে।

ফলে পূর্বের মতই নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর নানা ধরনের নিপীড়ন, মানবাধিকার হরণ, সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চুক্তির সমর্থক ও নিরীহ জুম্মদের উপর সন্ত্রাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত ব্যক্তি ও সংগঠনদের 'সন্ত্রাসী', 'অস্ত্রধারী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ইত্যাদি তকমা দিয়ে অপরাধীকরণ, সেটেলার বাঙালি ও



রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জুম্মদেরকে সাম্প্রদায়িক হামলা, হয়রানি, ভূমি বেদখল, পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, ধর্মান্তরকরণ ও জুম্ম নারী-শিশুদের উপর সহিংসতা ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপরোল্লেখিত পরিস্থিতির নিরিখে নেদারল্যান্ডের দ্যা হেগ শহরে ২৯-৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউএনপিও-এর ২১তম সাধারণ পরিষদ এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে–

(ক) বাংলাদেশ সরকারের প্রতি:

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা।

৩) অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি পূর্বক জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যার্পণ করা।

(খ) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি:

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রদান করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত বাংলাদেশ সেনা সদস্যাদেরকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োগ না করা।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের মানবাধিকার পরিস্থিতি সরেজমিন তদন্তের জন্য জাতিসংঘের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোটিয়রকে বাংলাদেশ সফরের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(গ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতি:

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

সরকার গঠনের ৫ মাসেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি নেই: মতবিনিময় সভায় ক্ষোভ

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' বাস্তবায়নে কোনো দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। এ পরিস্থিতি নিরসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে অবিলম্বে একটি জাতীয় কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।

গত ২৯ জুলাই ২০২৬ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'-এর উদ্যোগে 'বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ৫ মাস: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের অন্যতম সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় সুশীল সমাজের





প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা অংশ নেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালার আলোকে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণেরও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রযোজ্য। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ ১৭ বছর ক্ষমতায় থেকেও এর মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়ন করেনি; বরং দমন-পীড়ন ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে।

বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার তাদের ঘোষিত ৩১ দফায় বহুজাতিক ও বহুত্ববাদী 'রেইনবো নেশন' গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিরতার মধ্যে রেখে দেশে টেকসই শান্তি, গণতন্ত্র ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার অবসান ঘটেনি। নিরাপত্তার অজুহাতে সেখানে কার্যত এক ধরনের অঘোষিত সামরিক শাসন ও অতিমাত্রায় সামরিকীকরণ বহাল রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, পার্বত্য সমস্যা কেবল পাহাড়ের কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, এটি দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও সমঅধিকারের প্রশ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার জন্য অবিলম্বে একটি জাতীয় কমিশন গঠন করা জরুরি।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)-এর নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা উল্লেখ করেন যে, এই চুক্তি কোনো একক দলের কৃতিত্ব নয়, এরশাদ সরকার, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সবার আলোচনার পথ ধরেই এটি অর্জিত হয়েছিল। বর্তমান সরকার দ্রুত এ সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের পর রাষ্ট্র নিজে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তাই এর পূর্ণাঙ্গ ও আন্তরিক বাস্তবায়নের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল ক্বাফি রতন ও বাসদের ফজলুল রশিদ ফিরোজ পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ভূমি সমস্যা, আদিবাসী পরিচয় নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ওপর সাম্প্রতিক বিভিন্ন হামলার ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

মতবিনিময় সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সরকারের ঘোষিত ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচিতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হলেও গত ৫ মাসে কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অ-পাহাড়ি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়টি সরকারের সদিচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ৬টি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হয়:

১. পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অবিলম্বে একজন পাহাড়ি প্রতিনিধিকে পূর্ণমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেওয়া এবং চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক অ-পাহাড়ি প্রতিমন্ত্রীকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা।

২. চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিদ্যমান উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ও কার্যকর করা।

৩. চুক্তি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৪. দ্রুততম সময়ের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা।

৫. প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করে 'পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন' দ্রুত কার্যকর করা।

৬. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সরকারের উচ্চপর্যায়ে নীতিনির্ধারণী সংলাপের আয়োজন করা।

বক্তারা একমত পোষণ করেন যে, সমতা, ন্যায়বিচার এবং টেকসই জাতীয় সংহতি অর্জনের স্বার্থে পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত থাকলে সমগ্র বাংলাদেশও শান্তিতে থাকতে পারবে না: ঢাকায় নাগরিক সমাবেশে—আবু সাঈদ খান

গত ৫ অক্টোবর ২০২৬ সোমবার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' কর্তৃক আয়োজিত সাম্প্রতিক চুক্তির সাথে



সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ৩ টি আলাদা জাতীয় কমিটি গঠন করার প্রতিবাদে শাহবাগে এক নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় সংগঠনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ খান, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল প্রমুখ।

আবু সাঈদ খান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে এমন ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একটি দেশের কোনো জনগোষ্ঠী যদি দীর্ঘদিন বঞ্চিত ও উপেক্ষিত থাকে, তাহলে সেই দেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বাঙালি হিসেবে পরিচিত করার যে অবস্থান নেওয়া হয়েছিল, তৎকালীন সংসদে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এম এন লারমা। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, তিনি বাঙালি নন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেননি। বাংলাদেশ কেবল বাঙালির রাষ্ট্র নয়, কেবল মুসলমানের রাষ্ট্রও নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত থাকলে সমগ্র বাংলাদেশও শান্তিতে থাকতে পারবে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুধু পাহাড়ের মানুষের সমস্যা নয়, এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের মানুষ অস্ত্র ছেড়েছে বলে তাদের সঙ্গে যা ইচ্ছা করা যাবে এমন ধারণা ভুল। পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিতে হবে এবং তাদের আবার অস্ত্র ধরতে বাধ্য করা যাবে না। সম্প্রতি গঠিত তিনটি কমিটি বাতিল করে চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান তিনি।

শামসুল হুদা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক আলোচনা হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বিএনপি সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে। দলটি একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের কথা বললেও ক্ষমতায় থাকাকালে চুক্তি বাতিলের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অখণ্ডতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। সম্প্রতি গঠিত তিনটি কমিটির সমালোচনা করে শামসুল হুদা বলেন, এসব কমিটি মূলত আমলা ও গোয়েন্দা-নির্ভর। এ ধরনের উদ্যোগ কোনোভাবেই কাম্য নয়।

নাজমুল হক প্রধান বলেন, দেশে আন্দোলন হচ্ছে, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব অর্থে কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না। বিশেষ করে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। তিনি বলেন, রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে চুক্তি করেছে এবং সেই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।



রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চুক্তি নয়, বরং রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি। তাই চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা ভূমি সমস্যা। অথচ দীর্ঘদিনেও এই সমস্যার কার্যকর সমাধান হয়নি। সম্প্রতি গঠিত তিনটি কমিটি কার্যক্রম শুরু করলে পাহাড়ের বিদ্যমান সমস্যাগুলো আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে পাহাড়ের জনগণের প্রত্যাশা ছিল চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত হচ্ছে না এবং অ-পাহাড়ি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বলে তিনি জানান। গত ১০ সেপ্টেম্বর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয়, নির্বাহী ও পরামর্শক তিনটি কমিটি গঠন করেছে। এসব কমিটির কার্যপরিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং আইন ও বিধি সংস্কারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুটি কমিটির প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা ডিজিএফআই থেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অতীতের স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, সামরিক ও বেসামরিক আমলা-নির্ভর শাসনের ফলে পাহাড়ে সংঘাত, রক্তপাত, বিভেদ ও বিদ্বেষ বেড়েছে। ১৯৯৭ সালের চুক্তি ছিল সংঘাত থেকে বেরিয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উদ্যোগ। তিনি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানান। বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব জোরদারের মাধ্যমে 'উল্টো পথে যাত্রা' হিসেবে দেখছেন বলেও জানান তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারের কার্যকর উদ্যোগের আহ্বান জানান জাকির হোসেন।

এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে রাজনৈতিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধানের আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়—

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক তিনটি কমিটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে;

২. পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ-পাহাড়ি প্রতিমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যাহার করতে হবে;

৪. চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ও কার্যকর করতে হবে;

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

৬. বিধিমালা প্রণয়নসহ দ্রুততম সময়ে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করতে হবে;

৭. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সংলাপ আয়োজন করতে হবে;

৮. পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যাসহ সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে বহুপক্ষীয় অর্থবহ সংলাপ শুরু করতে হবে।

> 'এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে (সংবিধানে) প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।' *– এম এন লারমা*





পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তিনটি কমিটি বাতিলের দাবিতে রাজধানীতে ছাত্র-যুব সংগঠনগুলোর গণসংযোগ

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org